সম্পাদকীয়

ডিসেম্বর ২০১৫, বছর শেষের বুলেটিন সংখ্যায় আমাদের প্রচ্ছদকাহিনি 'শিশুশ্রমের আইনি সুরক্ষা'। শিশু হত্যার ক্ষেত্রে বর্তমান বছর বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, যে ধরনের ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর পন্থায় শিশুদের হত্যা করা হয়েছে তা ছিল নজিরবিহীন। নিহত শিশুদের অনেকেই শিশু শ্রমিক। আইন ও সালিশ কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে শ্রমজীবী শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। তাদের লেখাপড়া শেখানো, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোসহ স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলো আসক-এর শিশু অধিকার ইউনিটের কাজের অন্তর্ভুক্ত। সারা দেশে ২৯ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত সাত দিনে সাত শিশু হত্যার শিকার হয়েছে। বছর শেষে দ্রুততার সঙ্গে রাজন, রাকিব, সাঈদ হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। এর রায়সহ এবারের বুলেটিনের 'আইন-আদালত' পর্বে যথারীতি রয়েছে আদালতের রায় পর্যালোচনা এবং আইনি সংবাদ। এ-সংক্রান্ত বছরচুক্তিখতিয়ানের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে এ পর্বে।

আমাদের 'তথ্যানুসন্ধান' পর্বের 'হোসেনী দালানে বোমা বিস্ফোরণ' শিরোনামের লেখাটি বিষয়ের দিক থেকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিয়া সম্প্রদায় হামলার শিকার হলেও বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। সম্প্রতি বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর নামে ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দেশি ও বিদেশি মানুষের ওপর হামলা হচ্ছে, যা আগে কখনো এত ব্যাপকভাবে হয়নি। চলতি বছর নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচজন 'মুক্তমনা' লেখক-প্রকাশক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, আহত হয়েছেন দুজন আর চরম আতঙ্কের মধ্যে আছেন অনেকেই। এর মধ্যে নতুন করে হুমকি দেয়া হয়েছে ড. আনিসুজ্জামান ও হাসান আজিজুল হকের মতো প্রতিথযশা লেখক-বুদ্ধিজীবীকে। দুঃখজনক যে, উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডের একটিরও পুরোপুরি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কাউকে কাউকে আটক করা হলেও তারাই যে প্রকৃত হত্যাকারী, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানাতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বিচারকার্যও চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে।

আমরা আজ এমন এক সংঘাতময় বিশ্বে বসবাস করছি, বহু মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, নিজের আবাসভূমিতে থাকার নিশ্চয়তা নেই। ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের তথ্য অনুযায়ী এ বছর (নভেম্বর পর্যন্ত) মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভূমধ্যসাগর দিয়ে পাড়ি দিয়েছে ৭ লাখ ৩৫ হাজার, ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে মারা গেছে ৩ হাজার ৬৭১ জন শরণার্থী। সাগরের বেলাভূমিতে রঙিন জামা-মোজা পরা তিন বছরের শিশু আইলানের নিথর দেহ বিপন্ন শরণার্থীরই প্রতীক। তার নিষ্পাপ 'ঘুমন্ত' চেহারার মর্মস্পর্শী ছবিটি বিশ্ববিবেকে সাড়া তুলেছিল। আইলানের দেশ এখন পরাশক্তিদের শক্তির মহড়ার কেন্দ্রে। আইএসের কার্যকলাপ সাধারণ মানুষকে সন্ত্রস্ত করে সন্দেহ নেই, পরাশক্তির বোমা হামলা কি মানুষকে শঙ্কিত করে না? মানুষের জীবনের বিনিময়ে, বিতাড়নের মধ্য দিয়ে পরাশক্তির প্রতিযোগিতা চলে, অস্ত্র কারখানায় উৎপাদন বাড়ে, ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের অপ্রত্যাশিত রিটার্ন আসে। এমন এক প্রতিকারহীন চক্রে আবদ্ধ যেন মানুষগুলো। ■

উপদেষ্টা সম্পাদক: হামিদা হোসেন, সুলতানা কামাল, এডভোকেট ইদ্রিসুররহমান ❑ সম্পাদক: শাহীন আখতার
আইনগত সম্পাদনা: আবুওবায়দুররহমান ❑ প্রকাশনা সহযোগী: কানিজ খাদিজা সুরভী, সমীর কর্মকার ❑ প্রচ্ছদ: মনন মোর্শেদ
অঙ্গসজ্জা: অনিল চন্দ্র মন্ডল ❑ কম্পিউটার কম্পোজ: মো. মহসিন আলী, রিজওয়ানুলহক
ফটোগ্রাফ: আসক, ইন্টারনেট ❑ প্রচ্ছদের ছবি: সৌজন্যে 'কল টুহিউম্যানিটি' ❑ মুদ্রক: সাহিত্য প্রকাশ

শিশু শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা

ইমতিয়াজ আহমেদ সজল

বিশ্বব্যাপী শিশুশ্রম একটি উদ্বেগের বিষয়। বিশেষত দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিযুক্ত হওয়ার হার বেশি, কারণ সেখানে প্রতিনিয়ত তাদের মুখোমুখি হতে হয় দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের। শিশু শ্রমকে ত্বরান্বিত করতে আরো ভূমিকা রাখছে– চাকরির অবস্থা ও পরিবেশের নাজুকতা, অনির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি, শ্রমিকদের ওপর শোষণ, জীবনমান ও মানসম্মত শিক্ষার অভাব, আইনি বিধানাবলির প্রয়োগহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, জেন্ডার-বৈষম্য ও শৈশবের ধারণাগত দিকসমূহ। এসব কারণেই শিশুরা বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ও শোষণমূলক কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকে। শিশুশ্রমের সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা না থাকলেও সাধারণভাবে বলা হয়– যে শ্রম শিশুদের জন্য ক্ষতিকর অথবা যা যে-কোনোভাবে (শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা শিক্ষায় অনভিগম্যতা) শিশুদের শোষণ করে। এ নিবন্ধে আমরা দেখব, বাংলাদেশে শিশুশ্রমের বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে শিশুরা কতটুকু সুরক্ষিত, আইনি কাঠামোর ফারাক ও সীমাবদ্ধতা এবং সবশেষে থাকবে কিছু সুপারিশ।

বাংলাদেশে শিশু শ্রমের বিরাজমান অবস্থা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে শিশুশ্রমের ওপর তৈরি করা একটি জরিপ প্রকাশ করে ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে। যাতে দেখানো হয়, দেশে ১০-১৪ বছর বয়সি ১০ লক্ষ শিশু বিভিন্ন ধরনের শ্রমে যুক্ত আছে। বাংলাদেশের এসব শ্রমজীবী শিশু মূলত তিনটি খাতে যুক্ত। কৃষি খাতে ৩৯ শতাংশ, বিভিন্ন চাকরি ৪১ শতাংশ আর অন্যান্য খাতে কাজ করছে ২০ শতাংশ। বাস্তবে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আরো অনেক বেশি, যেমনটি ২০০৯ সালে করা আইএলও, ইউনিসেফ ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ৫-১৭ বছর বয়সি ৫০ লক্ষ শিশু বিভিন্ন ধরনের শ্রমে যুক্ত, তন্মধ্যে ২০ লক্ষই যুক্ত বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। সাধারণত খুব কম মজুরিতে দীর্ঘ সময় কাজ করিয়ে শিশুদের সহজেই শোষণ করা যায় বিধায় কলকারখানার মালিকরা তাদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পারিবারিক দারিদ্র্য ও নানাবিধ আর্থসামাজিক দুরবস্থার শিকার হয়ে বাধ্য হয়েই একজন শিশুকে লেখাপড়া বাদ দিয়ে নামতে হয় রুটিরুজির ফিকিরে। ভাগ্যহত এই শিশুরাই জড়িয়ে পড়ে নানান ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। তাদের দেখা যায় মোটরযান মেরামত, ঝালাই, ব্যাটারি পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সড়ক পরিবহণে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে, জাহাজ ভাঙা, ইট ভাঙা ও বিড়ি কারখানায় কাজ করতে। মোটা দাগে এ দেশের সিংহভাগ শিশু শ্রমিকই কাজ করছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, যেখানে তাদের জন্য নেই ন্যূনতম মজুরি, কর্মঘণ্টা, পেশাগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা এবং কোনো ধরনের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা।

শিশুশ্রম-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ

মূলত সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের সময়কাল থেকেই শিশুশ্রম একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যসহ কিছু দেশ শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন-নীতি প্রণয়ন করে। দীর্ঘসময় পর ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই আইএলও শিশুশ্রম নিরোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। যার ফলে ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনেই শিশুশ্রম-বিষয়ক একটি কনভেনশন (নং-৫) গ্রহণ করে। এযাবৎ আইএলও কর্তৃক গৃহীত শিশুশ্রম-বিষয়ক কনভেনশনগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কনভেনশন এখানে আলোচনা করা হলো।

(ক) অত্যন্ত খারাপ ধরনের শিশুশ্রম কনভেনশন ১৯৯৯ (নং ১৮২): এ কনভেনশনে শিশুদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর কিছু কাজকে সবচেয়ে খারাপ ধরনের (Worst Forms) শ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। খারাপ ধরন নির্ধারণে দীর্ঘসময় ধরে করানো রাত্রিকালীন কোনো কাজ কিংবা যেখানে একজন শিশুকে অযৌক্তিভাবে আবদ্ধ রেখে কোনো কাজ করানো হয়, এসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। যেমন– শিশুদের দাসত্বে নিপতিত করা, শিশুদের বিক্রয় ও পাচার করা, জবরদস্তি বা বলপূর্বক শ্রমে নিযুক্ত করা, কোনো শিশুকে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত করা, গণিকাবৃত্তি বা পর্নোগ্রাফি তৈরির জন্য কোনো শিশুকে ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবহার করা, মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে এমন সব কাজ।

(খ) ন্যূনতম বয়স কনভেনশন, ১৯৭৩ (নং ১৩৮): এ কনভেনশনে বলা হয়েছে, অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো কোনো কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সসীমা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করবে, যাতে একজন শিশু তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারে। শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে তাদের কাজে নিয়োগের বয়সসীমা কোনোভাবেই ১৫ বছরের কম করা যাবে না। তবে উন্নয়নশীল দেশে শুরুতে ১৪ বছর করা যাবে। বাংলাদেশ এখনো এই কনভেনশনটি স্বাক্ষর করেনি।

(গ) গৃহশ্রমিকদের শোভন কাজসংক্রান্ত কনভেনশন ২০১১ (নং ১৮৯): এ কনভেনশনে বলা হয়, গৃহকর্মও একটি কর্ম; গৃহশ্রমিকরাও শ্রমিক; এবং তারা অন্যান্য শ্রমিকদের মতো শোভন কাজের অধিকারী।

এ কনভেনশনে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রকে গৃহশ্রমিকদের জন্য নিয়োগ-সংক্রান্ত চুক্তি, যথাযথ পরিদর্শনের ব্যবস্থা, অভিযোগ পেশ ও শ্রম বিচারব্যবস্থায় আশ্রয় লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে এবং মজুরি, কর্মঘণ্টা, বিশ্রাম ও ছুটির জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ, সংগঠিত হওয়া, দর-কষাকষির অধিকারের সংরক্ষণসহ দেশের অন্যান্য শ্রমিকের ন্যায় প্রয়োজনীয় সুযোগ ও ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করে গৃহশ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করতে নির্দেশনা প্রদান করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো এ সনদে অনুস্বাক্ষর করেনি।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯

শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ৩২-এ বলা হয়েছে পক্ষরাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে এবং শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ অথবা শিশুর শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কিংবা তার স্বাস্থ্য বা শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক বিকাশের পক্ষের ক্ষতিকর কাজ করানো থেকে রক্ষা করবে। পক্ষরাষ্ট্রসমূহ এ অনুচ্ছেদের বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবে, যাতে কার্যে নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সসীমা, কর্মঘণ্টা ও কাজের শর্তাবলি এবং এগুলোর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে যথাযথ শাস্তি বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার-বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬

এ চুক্তির বাস্তবায়নে পক্ষরাষ্ট্রসমূহ অনুচ্ছেদ ১০(৩) অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ থেকে শিশু-কিশোরদের রক্ষা করবে, তাদের নৈতিক ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অথবা তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করতে পারে, এরূপ কোনো কর্মে তাদের নিয়োগ প্রদান আইনত দণ্ডনীয় করবে। পক্ষরাষ্ট্রসমূহকে এ রকম বয়সসীমা নির্ধারণ করতে হবে, যাতে এর নিচের বয়সের শিশুদের মজুরিযুক্ত কোনো কাজে নিয়োগ প্রদান আইনত নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান

সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে একটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও জনগণের মৌলিক অধিকারের সনদ। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে আমরা খুঁজে পাই শিশু শ্রমিকদের সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব। অনুচ্ছেদ ১০-এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্র মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। অনুচ্ছেদ ১৪ বলছে, কৃষক-শ্রমিকসহ দেশের সব মেহনতি মানুষকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দেয়া রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী, রাষ্ট্র জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উৎকর্ষ

সাধনে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাবে; যুক্তিগত মজুরি, বিশ্রাম, বিনোদন, অবকাশ ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করবে। অনুচ্ছেদ ১৭-তে রাষ্ট্র কর্তৃক সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে জনগণের মৌলিক অধিকার অংশে রাষ্ট্রীয় সব ধরনের বৈষম্য থেকে মানুষের বাঁচার অধিকার বিবৃত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৮ অনুযায়ী, রাষ্ট্র চাইলে শিশু শ্রমিকদের কল্যাণে, বৈষম্যমূলক হলেও ইতিবাচক বিধান প্রণয়ন করতে পারবে। শিশু শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকল্পে অনুচ্ছেদ ৩৪-এ সব ধরনের জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় আইনানুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আইনানুযায়ী স্বাধীনভাবে যে-কোনো পেশা বা কাজ বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছে সংবিধান অনুচ্ছেদ ৪০-এ। এসব মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করার অধিকার দিয়েছে সংবিধান অনুচ্ছেদ ৪৪-এ।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

বাংলাদেশে শিশু শ্রম সংক্রান্ত বিধানাবলি পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন আইনে বিদ্যমান ছিল। শ্রম আইন, ২০০৬-এ সেই বিধানগুলোকে সংশোধিত ও সুসংহত আকারে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ আইনের ধারা ২-এ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে (ফরমাল সেক্টর) শিশুদের নিয়োগের বিধানকল্পে 'শিশু' ও 'কিশোর'-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেনি, এমন যে-কেউ শিশু হিসেবে গণ্য হবে। আর ১৪ বছর পূর্ণ করেছে কিন্তু ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেনি, তাহলে কিশোর হিসেবে গণ্য হবে। শ্রম আইনের ধারা ৩৪-এ বিধান করা হয় যে, কোনো পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না বা কাজ করতে দেয়া যাবে না। আর একজন কিশোরকে নিয়োগের পূর্বে রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত সক্ষমতা প্রত্যয়নপত্র (সার্টিফিকেট অব ফিটনেস) লাগবে। কিন্তু ধারা ৪৪-এ ১২ বছর পূর্ণ করেছে, এমন শিশুদের হালকা কাজ (Light Work) এবং যা তার স্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য বিপজ্জনক (Hazardous) নয় এবং তার শিক্ষাগ্রহণকে বিঘ্ন করে না, এমন কাজে কিশোরদের জন্য প্রযোজ্য শর্ত মেনে নিয়োগ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ধারা ৩৯, ৪০ ও ৪২-এ কিছু কিছু কাজে কিশোরদের নিয়োগদানে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন– সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে-কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে, যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় পরিষ্কার করা, তেল দেয়া, ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির মাঝখানে কাজ করা, ভূগর্ভে বা পানির নিচে কাজ করা। ধারা ৪১-এ বিধান করা হয়েছে, কোনো কিশোরকে কোনো কারখানা বা খনিতে দৈনিক ৫ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা বা অধিকালসহ ৩৬ ঘণ্টার বেশি কাজে নিয়োজিত রাখা যাবে না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দৈনিক সাত ঘণ্টা, সপ্তাহে ৪২ বা অধিকালসহ ৪৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। আর কিশোরদের এই কাজের সীমা হবে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা শিশুর অভিভাবক এ আইনের বিধান লঙ্ঘন করে কোনো শিশু বা কিশোরকে চাকরিতে নিযুক্ত করলে বা চাকরি করার অনুমতি দিলে তিনি ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। উক্ত বিধানাবলি ছাড়াও শ্রম আইনে শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের বিধান করেছে, যা সব বয়সের শ্রমিকদের জন্যই প্রযোজ্য।

শিশু আইন, ২০১৩

শিশু আইনে মূলত শিশু-কিশোর বিচারব্যবস্থায় আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশুদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আইনের নবম অধ্যায়ে শিশুসংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধেরও দণ্ডবিধান করা হয়েছে। যেখানে শিশুর প্রতি সব ধরনের নিষ্ঠুরতা এবং শিশুদেরকে বিভিন্ন অনৈতিক ও অবৈধ কাজে নিয়োগকে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য করেছে। ধারা ৭০-এ বলা হয়েছে, কোনো শিশুর দায়িত্বে থাকা কোনো ব্যক্তি যদি শিশুর প্রতি কোনো নিষ্ঠুর আচরণ করে, যার দ্বারা ঐ শিশুর কোনো মারাত্মক ক্ষতি হয়, তবে সে ব্যক্তি পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। ধারা ৮০-তে কোনো শিশুর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি কর্তৃক কোনো শিশুকে শোষণ করার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এ আইনে বর্ণিত শিশুদের জন্য কল্যাণকর বিধানাবলি অন্যসব শিশুদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে যুক্ত শিশু শ্রমিকদের জন্যও প্রযোজ্য।

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার জন্যই এ আইনটি প্রণীত হয়। আইনের ধারা ২-এ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত' হলো এরূপ বেসরকারি খাত, যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের কাজের বা চাকুরির শর্ত ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিবিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ সীমিত। আইনানুযায়ী 'শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন' একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা

এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এর প্রধান। ফাউন্ডেশনের প্রধান কাজ হলো শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিশু শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত বিধায় তাদের কল্যাণে এ প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন আইন ছাড়া সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালায় শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের কর্মপরিকল্পনার দৃষ্টান্ত মেলে–

(ক) জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালা, ২০১০ : এ নীতিমালায় শ্রম আইনে প্রদত্ত শিশু কিশোরের সংজ্ঞার ভিত্তিতে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে সব ধরনের শিশু শ্রম নিরসনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এ নীতিমালায় ক্রমান্বয়ে শিশু শ্রম বিলোপে ১০টি কৌশলগত কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে। যেসব ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতির ফলে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করে শিশুদের শ্রম থেকে নিবৃত্ত করা হবে। যেগুলো হলো– নীতিমালার বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ, আইনের প্রয়োগ, কর্মসংস্থান বা শ্রমবাজার, শিশুশ্রম নিরোধ ও শ্রমে নিযুক্ত শিশুদের নিরাপত্তা, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন সুসংহতকরণ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। এ নীতিমালার আলোকে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি শিশুশ্রম ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জাতীয় শ্রম নীতি, ২০১২

জাতীয় শ্রমনীতিতে শিশু শ্রম নিরসন সম্পর্কে বলা হয় যে, সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, শহর ও গ্রামাঞ্চলসহ সকল ক্ষেত্রে শিশুদেরকে যে-কোনো ধরনের শ্রমে নিয়োগের বিষয়কে নিরুৎসাহিত করবে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে শিশুদের অংশগ্রহণকে নিষিদ্ধ করতে এবং সংবিধানস্বীকৃত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তবে পারিবারিক ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা সমুন্নত রাখতে বিশেষ কিছু পেশায় (জামদানি, তাঁত, কাঠ, মৃৎ ও স্বর্ণশিল্প ইত্যাদি) শিশুদের অংশগ্রহণ প্রশিক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য হবে বলে এ নীতিমালায় উল্লেখ আছে।

জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩

এ নীতিমালায় কৃষিখাতে শ্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে, কৃষি শ্রমিক কল্যাণকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হবে এবং আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে ঝুঁকিপূর্ণ কৃষি কাজে, যেমন : বালাইনাশক প্রয়োগ, ভারী, ধারালো ও ঘূর্ণায়মান কৃষি যন্ত্রপাতি চালানো) শিশুশ্রম ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হবে।

আইনি বিধানাবলির সীমাবদ্ধতা

- শিশু আইন, ২০১৩-তে ১৮ বছর পর্যন্ত সবাইকে শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করলেও শ্রম আইনে এ বয়সিদের শিশু ও কিশোর দুভাগে ভাগ করেছে। প্রথমে শিশুদের সব ধরনের শ্রমে নিয়োগকে নিষিদ্ধ করলেও পরবর্তী সময়ে আবার ১২ বছর পূর্ণ করেছে, এমন শিশুদের নিয়োগের বিধান শিথিল করা হয় 'হালকা' ও 'বিপজ্জনক' নয়, এমন কাজে। কিশোরদের সুনির্দিষ্ট কিছু 'ঝুঁকিপূর্ণ' কাজে নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। শ্রম আইন প্রণয়নের প্রায় এক যুগ পর ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করে। এতে 'হালকা', 'বিপজ্জনক' কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের আংশিক তালিকা দেয়া হয়েছে। বয়স নিয়ে অসংগতি ও সুনির্দিষ্ট কার্যতালিকার অভাব শিশু শ্রমকে ত্বরান্বিত করছে। আইনে শিশু-কিশোর শ্রমিক নিয়োগের বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। অধিকন্তু মাত্রাতিরিক্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ থাকলেও এই সমান অর্থদণ্ডারোপের ঘটনাও বিরল। শিশু-কিশোর সংক্রান্ত বিধানাবলিসহ শ্রম আইনের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ পরিবীক্ষণের দায়িত্বে আছে 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর'। দেশের বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধমান কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার মতো পর্যাপ্ত জনবল অধিদপ্তরের নেই।
- শ্রম আইনের বিধানাবলির প্রয়োগ শুধু প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্যই প্রযোজ্য। এদিকে বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকদের প্রায় ৮০ ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত, ফলে তারা শ্রম আইনের সুরক্ষার বাইরেই থেকে গেল। দেশের শিশু শ্রমিকদের একটা বড় অংশ (বিশেষত কন্যাশিশু) গৃহকর্মে যুক্ত। গৃহশ্রমিকদেরও শ্রম আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। ফলে এদের মজুরি, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, ছুটি কোনো কিছুরই কোনো মানদণ্ড নির্ধারিত নেই। শ্রমের ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলে বা অন্যায় আচরণের শিকার হলে অভিযোগ জানানো বা শ্রম আদালতে আশ্রয় লাভের কোনো সুযোগ এদের নেই।
- নীতিমালাগুলোতে কিছু প্রগতিশীল বিধান থাকলেও আইনি বিধান না হওয়ায় এগুলোর প্রয়োগ সম্ভব নয়। ■

মানবাধিকার দিবসের ভাবনা

সুলতানা কামাল

দশ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। জাতিসংঘ এবার বিশেষভাবে এ দিবসকে পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে, কারণ মানবাধিকারকে সংজ্ঞায়িত করা এবং তা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের যে মানবাধিকার আন্দোলন শিগগিরই তা ৫০ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে।

৫০ বছর আগে ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার' এবং 'অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার' বিষয়ক দুটি আলাদা সনদ গ্রহণ করে। এর আগে ১৯৪৮ সালে গ্রহণ করা হয়েছিল 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা'। এই তিনটি দলিলকে একসাথে 'অধিকারের আন্তর্জাতিক দলিল' হিসেবে স্বীকার করা হয়। শুরুতে একটা দলিলই হবার কথা ছিল। মনে করা হয়েছিল– জাতিসংঘ মানবাধিকার এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সনদ তৈরি করবে, যা সবাই মানতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু নানাবিধ বৈশ্বিক কারণে শেষমেশ তিনটি আলাদা দলিল সম্পাদন করতে হয়।

এবারের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য জাতিসংঘ নির্ধারণ করেছে– 'আমাদের অধিকার, আমাদের স্বাধীনতা– থাকুক সর্বদা'। এবারের মানবাধিকার দিবস ঘিরে বছরব্যাপী ব্যাপক প্রচারণাও হাতে নিয়েছে জাতিসংঘ। মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক দলিলগুলো যেহেতু অধিকার চর্চার স্বাধীনতাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়, তাই এ বছরের প্রতিপাদ্যে জাতিসংঘও অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে সর্বদা যেন আমাদের স্বাধীনতা অটুট থাকে, তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

কিন্তু ২০১৫ সালে বাংলাদেশে অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' বিষয়টা ছিল চরম উপেক্ষিত। জীবনের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে জীবনধারণের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা থেকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ভিন্নমত পোষণ করা থেকে শান্তিপূর্ণভাবে তা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা– সবকিছুই হয়েছে নিদারুণভাবে উপেক্ষিত।

২০১৪ সালের মতো ২০১৫ সালও শুরু হয় রাজনৈতিক সহিংসতা দিয়ে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি প্রধান বিরোধী দলসমূহের বর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে সেই নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচনের দাবিতে ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি সমাবেশ অনুষ্ঠানের কর্মসূচি দেয় বিরোধী দলগুলো। সরকারের পক্ষ থেকে সেই কর্মসূচি পালনের অনুমতি না দিয়ে বিএনপি নেত্রীকে তাঁর কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, সম্ভাব্য নাশকতা এড়ানোর জন্যই সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি এবং বিএনপি নেত্রীকে সমাবেশে যেতে দেয়া হয়নি। এর পরদিন থেকেই সারা দেশে শুরু হয় বিরোধী দলের ডাকা লাগাতার অবরোধ এবং একই সঙ্গে নাশকতা। টানা ৬৬ দিন ধরে চলে এই অবরোধ। অবরোধ চলাকালীন পেট্রোল বোমা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান ৭০ জন। এসব হামলা থেকে রক্ষা পাননি নারী-শিশু-বৃদ্ধ। হামলা হয়েছে স্কুলে, পাঠ্যপুস্তকবাহী গাড়িতে। হত ও আহতদের প্রায় প্রত্যেকে ছিলেন সাধারণ মানুষ, বেশিরভাগই দরিদ্র– বাস ও ট্রাকের চালক, সহকারী– রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের সরাসরি সংশ্রব নেই। এর বিপরীতে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীর বলপ্রয়োগের মাত্রাও এ সময় ভয়ংকরভাবে বেড়ে যায়। আমাদের তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছর অক্টোবর পর্যন্ত গুমের শিকার হয়েছেন ৪৭ জন। নভেম্বর পর্যন্ত কথিত ক্রসফায়ার আর বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছেন ১৫৩ জন। উল্লেখ্য, এসব বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের যারা শিকার হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদিও এসব হত্যাকাণ্ডের দায় অস্বীকার করেছে, কিন্তু অধিকাংশের স্বজনের অভিযোগ– তাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়েই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে চলতি বছরের চিত্র ছিল উদ্বেগজনক। একদিকে মুক্তমনা লেখক-প্রকাশকদের ওপর হামলা এবং তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা, অন্যদিকে আইনি, প্রশাসনিক ও বিচারিক পদ্ধতিতে ভিন্নমতকে রুদ্ধ করার চেষ্টা। সর্বোপরি ভিন্নমতের প্রতি যে ব্যাপক অসহিষ্ণুতা তৈরি হয়েছে, তাকে নিরুৎসাহিত না করে বরং প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি বইমেলা থেকে ফেরার পথে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ রায়কে। তাঁর স্ত্রী ও সহ-লেখক রাফিদা আহমেদ বন্যাও মারাত্মকভাবে জখম হন। অভিজিৎ রায়ের হত্যাকাণ্ডের স্থান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নাগালের বাইরে ছিল না, হামলার সময় কাছেই পুলিশ সদস্যরা উপস্থিতও ছিলেন, কিন্তু তারা ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন। এরপর 'মুক্তমনা' হিসেবে বিবেচিত লেখক-প্রকাশকদের জন্য দেশটি হয়ে ওঠে যেন এক 'মৃত্যু উপত্যকা'! ফেব্রুয়ারিতে অভিজিৎকে হত্যা দিয়ে শুরু হয়ে চলতি বছর নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচজন মুক্তমনা লেখক-প্রকাশক নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, আহত হয়েছেন দুজন আর চরম আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন অনেকে। এর মধ্যে নতুন করে হুমকি দেয়া হয়েছে ড. আনিসুজ্জামান ও হাসান আজিজুল হকের মতো প্রতিথযশাসহ আরো অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবীকে। এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কাউকে কাউকে আটক

করা হয়েছে, কিন্তু তারাই যে প্রকৃত হত্যাকারী, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানাতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বিচারকার্যও চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। উপরন্তু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা নানা সময়ে এমন বক্তব্য দিয়েছেন, যার মাধ্যমে অপরাধীদের উৎসাহ পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্বকারী বৈশিষ্ট্য, বিশেষত ৫৭ ধারা নিয়ে আমরা বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করে এসেছি। সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল সাংবাদিক প্রবীর সিকদারকে এই আইনে আটক করা, রিমান্ডে নেয়া। পরে চটজলদি জামিন মঞ্জুর করে তাঁকে মুক্তি দেয়া। অভিযোগ ওঠে যে, প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বার্থবিরুদ্ধ অবস্থান নেবার কারণে তাঁকে এই আইনে আটক করা হয় এবং রিমান্ডে নেয়া হয়। কিন্তু পরে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে তাঁর জামিনের ব্যবস্থা হয়। আইন ও আদালতকে মর্জিমাফিক চালানোর এ ধরনের আরেকটি ঘটনা– পথশিশুদের নিয়ে কাজ করা অদম্য ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবকদের আটক করা, রিমান্ডে নেয়া এবং প্রায় দুই মাস পর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তাঁদের জামিন লাভ। উভয় ঘটনাতেই ভুক্তভোগীদের জামিন লাভ স্বস্তিকর বটে, কিন্তু এসব ঘটনায় যে প্রক্রিয়ায় আইন-আদালতসহ সংশ্লিষ্ট সবাই তাদের ভূমিকা রেখেছেন তা গভীর উদ্বেগের বিষয়। এ লেখা যখন লিখছি তখন ফেসবুক, ভাইবার ও হোয়াট্স অ্যাপ-এর মতো সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমগুলো বন্ধের প্রায় এক মাস হতে চলেছে।

এ বছর মানব পাচারের এক ভয়াবহ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে আমাদের সামনে। থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের অসংখ্য গণকবরের সন্ধান লাভ, গভীর সমুদ্রে ভাসমান ক্ষুধার্ত রোগাক্রান্ত মৃতপ্রায় মানুষদের ছবি-খবর, ইন্দোনেশিয়ার আচেহ উপকূলের কাছাকাছি দরিয়ায় খাবার নিয়ে ক্ষুধার্তদের মারামারিতে শতাধিক মানুষের প্রাণহানি– এসব খবর আমাদের সামনে এই বাস্তবতা হাজির করে যে, বাংলাদেশের বেকার, ভাগ্যান্বেষী মানুষরা দালালদের প্রলোভনে পড়ে, বৈধ ও সুগম পথে বিদেশে যাবার উদ্যোগের স্থবিরতার কারণে এই ঝুঁকিপূর্ণ অবৈধ উপায়ে মালয়েশিয়া যাবার পথ বেছে নিচ্ছে। এই দালালদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের ঘটনা আমরা দেখি না।

চলতি বছর জাতিসংঘের শিশু অধিকার রক্ষা কমিটিতে বাংলাদেশের শিশু-পরিস্থিতির মূল্যায়ন হয়েছে। এতে শিশুকল্যাণে নেয়া বিভিন্ন ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ কিছু সাধুবাদ পেয়েছে। কিন্তু শিশু হত্যার ক্ষেত্রে বর্তমান বছর বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। শুধু সংখ্যার দিকে থেকে নয়, যে ধরনের ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর পন্থায় শিশুদের হত্যা করা হয়েছে তা সমাজের বিশেষ বৈকল্যকে ইঙ্গিত করে। যে শিশুদের নৃশংস কায়দায় হত্যা করা হয়েছে, তাদের অনেকেই শিশু শ্রমিক। ২৯ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত সাত দিনে সাত শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। বছর শেষে আমরা দ্রুততার সঙ্গে রাজন, রাকিব, সাঈদ হত্যার বিচার সম্পন্ন হতে দেখছি বটে, কিন্তু শিশু হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনাগুলো শিশুদের প্রতি আমাদের আরো অধিক মনোযোগ ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সরকারদলীয় ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বেপরোয়া আচরণ এবং তাঁদের দায়মুক্তি দেবার চেষ্টা ছিল চলতি বছরের অন্যতম উদ্বেগের বিষয়। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ, এরকম সংঘর্ষ চলাকালে মায়ের পেটে শিশুর গুলিবিদ্ধ হওয়া, জনৈক সাংসদের গুলিতে শিশুর আহত হওয়া, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাতিজার বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে পথচারীকে আহত করা এবং পরবর্তী সময় পুলিশের তাকে রক্ষা করার চেষ্টা ইত্যাদি ঘটনা এই দুঃখজনক সত্যকে সামনে নিয়ে আসে যে, এ দেশে আইন সবার জন্য সমান নয়।

সভা-সমাবেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও চলতি বছরের চিত্র ছিল দুর্ভাগ্যজনক। বিরোধী দলগুলোকে কার্যত কোনো সভা-সমাবেশই করতে দেয়া হয়নি। বিভিন্ন অজুহাতে গ্রেফতার, জামিন না দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের মৌলিক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। বর্ষবরণ উৎসবে নারীদের যৌন হয়রানির প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশ, শিক্ষকদের দাবিদাওয়া প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, প্রশ্ন-ফাঁসের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ, আদিবাসীদের বিভিন্ন সমাবেশ– তা ভূমিরক্ষার আন্দোলনই হোক আর উৎসবের শোভাযাত্রাই হোক, অথবা সুন্দরবন রক্ষা অথবা রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় আয়োজিত শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ– সবকিছুকেই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভণ্ডুল করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। সেপ্টেম্বরে টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ছেলের সামনে মাকে নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিবাদে পুলিশের মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঘটনাটি ছিল নজিরবিহীন। এ ঘটনায় তিনজন নিহত হন এবং আরো অনেকে গুলিবিদ্ধ হন।

ধর্মীয় উগ্রপন্থার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার প্রবণতা চলতি বছরের আরেকটি উদ্বেগের বিষয়। বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর নামে দেশের এবং বিদেশের মানুষকে হত্যা, হুমকি প্রদান, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা এবং এসব নিয়ে সরকারের অস্বীকারের অথবা বিরোধীদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা আমাদের মনে গভীর শঙ্কার জন্ম দিয়েছে।

ভারতের সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত স্থলসীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর ছিল বর্তমান বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর মাধ্যমে ভিনদেশের জঠর থেকে মুক্ত হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের ১৬২টি ছিটমহল। প্রায় ৫৯ হাজার ছিটমহলবাসীর জন্য এটি ছিল স্বাধীনতা অর্জনের সমতুল্য। কিন্তু ছিটের মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমিসমস্যাসহ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাসহ আনুষঙ্গিক মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রতি কতটা নজর দেয়া হয় তা দেখার বিষয়।

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে দেখছি যে, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচণ্ড অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার নামে রাষ্ট্র নিপীড়নমূলক আচরণ করছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত বিচারে জনগণের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, বরং পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করেই কেবল রাষ্ট্রের প্রকৃত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। আর জনগণের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষা না করে তাদের সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয়।■

‘শরণার্থী সমস্যা’
মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের সুরক্ষা
জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

মুহাম্মাদ আমিরুল হক (তুহিন)

সাগরতীরে মৃত পড়ে থাকা ছোট্ট শিশু আইলান নাড়িয়ে দিয়ে গেল বিশ্ববিবেক। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর নির্দয় সব ভূখণ্ডওয়ালাদের নাড়া দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এর কৃতিত্ব কি তিন বছর বয়সি সিরিয়ান কুর্দি বালকের, নাকি ওই ফটোগ্রাফারের– যিনি সাগরতীরে তার মৃতদেহের ছবি ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন? এ বিতর্ক নিরর্থক হয়ে যায়, যখন দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলা এই ফটোগ্রাফ ‘সভ্য দুনিয়া’র অনেক অনেক প্রভাবশালী রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের মর্ম স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়।

সীমান্ত ঘেরা তার কেটে ঢুকছে শরণার্থীরা

‘শরণার্থী সমস্যা’ বা ইংরেজিতে ‘Refugee Crisis’ শাব্দিক অভিব্যক্তির মাঝেই আমাদের একটি মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে; মূর্ত হয়ে ওঠে অনভ্যর্থনা ও অসংবেদনশীলতার প্রতিবিম্ব। অথচ বিশ্বের কোন ভূখণ্ডের লোকদের শরণার্থী হবার অভিজ্ঞতা নেই, তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আজ যে সিরিয়ার অধিবাসীরা বিশ্বব্যাপী আশ্রয়লাভের জন্য দিগ্‌বিদিক ছুটছে, সেই সিরিয়াই একসময় কত লোকের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে! কত দেশের মানুষ এখানে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় পেয়েছে, জীবনধারণ এবং বেড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছে। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ২ হাজার ২০০ বছর পূর্বে নবী ইব্রাহিম (সা.) (আব্রাহাম) এই সিরিয়াতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন শরণার্থী হিসেবে। অথচ আজ বিশ্বের কত রাষ্ট্র সিরীয়দের জন্য তাদের রাষ্ট্রের দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধসংখ্যক রাজ্যে তাদের আশ্রয় মিলবে না– গভর্নররা জানিয়ে দিয়েছেন। যুক্তরাজ্য শরণার্থীদের আশ্রয় নিয়ে এ সমস্যার উত্তরণের পথ দেখছে না। ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জার্মানি অবশ্য তখন পর্যন্ত স্বাগত জানাচ্ছিল শরণার্থীদের। পিছে জার্মানির জনসংখ্যার ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রত্যাশাও গোপন নয়। আবার শরণার্থী শিবিরে অগ্নিকাণ্ড শরণার্থীদের প্রতি জার্মানদের অনভ্যর্থনার মনোভাবই মনে করিয়ে দিচ্ছে আমাদের।

শরণার্থীদের নিয়ে আমাদের মনোভাব যা-ই হোক না কেন, আন্তর্জাতিক আইনে শরণার্থীবিষয়ক অধিকারগুলো চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। মানবাধিকার-বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিলগুলো নিম্নরূপ–

সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮
অনুচ্ছেদ-১৪

‘প্রত্যেকেরই নিগ্রহের হাত থেকে বাঁচতে অন্য রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়লাভের অধিকার আছে।’

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে শরণার্থীদের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে, কেননা সেখানে ব্যক্তি বলতে রাষ্ট্রের নাগরিক ও অনাগরিক সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শরণার্থীদের মর্যাদাবিষয়ক কনভেনশন, ১৯৫১ সুনির্দিষ্টভাবে শরণার্থীবিষয়ক মানবাধিকারগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই কনভেনশনের অধীনে প্রণীত ১৯৬৭ সালের প্রটোকলও শরণার্থীবিষয়ক অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর বাইরেও জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন (United Nations High Commission for Refugee, UNHCR)-এর সংবিধি এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন দলিল শরণার্থীদের মানবাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনে শরণার্থীবিষয়ক মানবাধিকারের যত স্বীকৃতিই থাকুক না কেন, শরণার্থীদের মানবাধিকার-পরিস্থিতি যে সন্তোষজনক নয়, তা বলাই বাহুল্য। শিশু আইলানের নিথর দেহ দেখে সারা দুনিয়ার বিবেকবান মানুষ ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকাকে ছি ছি করেছে। তথাপি দেশে দেশে শরণার্থীর উৎপত্তি ঘটানোর পরিস্থিতি সৃষ্টির তৎপরতা কমেনি। আবার শরণার্থীদের জন্য দেশের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়াও কমেনি।

ভূমধ্যসাগরে ভাসমান শরণার্থী নৌকা

বিশ্বের দিকে দিকে আজ যুদ্ধের দামামা বাজছে। সময়টা নিরাপত্তাহীন ও অস্বস্তিকর। এক 'সন্ত্রাসবিরোধী' অভিযানে বিশ্বের মাতব্বর রাষ্ট্রগুলো এককাট্টা। 'ইসলামিক স্টেট' নামক অভিন্ন এক শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চললেও এখানে মিত্র শিবিরে বিভাজন আছে, আছে রাজনীতির অনেক হিসাবনিকাশ। আপাত-আড়ালে থাকা পরাশক্তিদের প্রতিযোগিতার বিষয়টি কখনো কখনো মাথা তুলে উঁকি দিচ্ছে। আরব বসন্তের প্রবল ঢেউ যে সিরিয়াতে এসে স্তিমিত হয়ে পড়ল, সেই সিরিয়াই এখন পরাশক্তিদের শক্তির মহড়ার কেন্দ্রে। 'ইসলামিক স্টেট'-এর ভয়াবহ নির্যাতন ও নিপীড়নের খবর আমরা পেয়েছি, জানতে পেরেছি তাদের সভ্যতাবিধ্বংসী তৎপরতার কথাও। আইএস-এর কার্যকলাপ সাধারণ মানুষকে সন্ত্রস্ত করে, সন্দেহ নেই। তবে পরাশক্তিদের গগনবিদারী যুদ্ধবিমান, বোমাহামলা এগুলোও কি মানুষকে সন্ত্রস্ত করে না? একজন মানুষ কেন তার ভিটেমাটি ছাড়ে? আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে অজানার পথে ছোটে? পরাশক্তিদের জঙ্গিবিমান তাদের 'ইসলামবাদী'দের হাত থেকে রক্ষার আশ্বাস দেয় না। অস্ত্র কারখানায় উৎপাদন বাড়ে, ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের প্রত্যাশিত রিটার্ন আসে। অন্যদিকে শরণার্থীদের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

ভিনদেশের কথা বাদ দিয়ে যদি নিজের দেশের দিকে তাকাই একই করুণ চিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে। বাংলাদেশ একই সঙ্গে শরণার্থীদের উৎস দেশ আবার শরণার্থীদের আশ্রয়দাতা দেশ। তথাপি বাংলাদেশ শরণার্থীর মর্যাদাবিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও তার প্রটোকল স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেনি। যদিও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদগুলো স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনে বাংলাদেশের ভূমিকা খুব একটা খারাপ নয়। নিজেদের শরণার্থী হওয়ার অভিজ্ঞতা (মুক্তিযুদ্ধ ও পার্বত্য চট্টগ্রামকেন্দ্রিক অস্থিরতার কারণে) এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার অভিজ্ঞতার পরও আমরা সরকারি ও বেসরকারি দুই পর্যায়েই শরণার্থীবিষয়ক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারিনি। আর এর মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়েও আমাদের অসচেতনতার দিকটি গোপন থাকেনি।

গত বছর আমাদের আইন মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও বাংলাদেশিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিয়ে নিবন্ধন নিষেধ করেছে। নিষেধ অমান্য করলে বিয়ে নিবন্ধনকারীর লাইসেন্স বাতিল হবে। আইন মন্ত্রণালয় আইনত তা পারে, কারণ কাজিদের তো লাইসেন্স দেয়া হয়েছে শুধু বাংলাদেশের নাগরিকদের বিবাহ নিবন্ধন করার জন্য। কেউ লাইসেন্সের বাইরে কাজ করলে লাইসেন্স বাতিল হবে, এটাই স্বাভাবিক– এতে আর নতুন করে পরিপত্র জারির কী দরকার আছে? পরিপত্রটিতে অবশ্য আমাদের মন্ত্রী মহোদয়গণের মনোভাব পুরোটা প্রকাশ পায়নি। মনের আসল ভাবটি হলো বাংলাদেশি নাগরিক রোহিঙ্গা বিয়ে করলেই শাস্তি, যা পরবর্তীতে মন্ত্রিগণের কঠিন কঠোর বিভিন্ন বক্তব্যে পরিষ্কার হয়েছে। অথচ দেশে বিয়ে নিষিদ্ধকরণ-সংক্রান্ত এরূপ কোনো আইন নেই। বাংলাদেশের নাগরিক বিশ্বের যে-কোনো দেশের নাগরিককে বিয়ে করতে পারেন। তাহলে রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈষম্য কেন?

শরণার্থী অধিকার নিয়ে আমরা এখন যত আলোচনাই করি বা যত উদ্বেগের কথাই বলি না কেন, সিরিয়ান যুবক আবদুল্লাহ কুর্দির তাতে আগ্রহ নেই। কুর্দি সমুদ্রসন্তান আইলান, গালিপ ও স্ত্রী জাহিনকে হারিয়ে এখন মাতৃভূমি সিরিয়াতেই ফিরে গেছেন। তিনি আর কখনোই কোনো দেশে শরণার্থী হবেন না বলে জানান। আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার যতই তাকে সুরক্ষার অঙ্গীকার করুক না কেন, দেশে দেশে শরণার্থীবিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো এখন এতটাই অর্থহীন, তা সে ইউরোপেই হোক আর বাংলাদেশেই হোক। মানুষটি সিরীয়ই হোক আর রোহিঙ্গাই হোক। ■

জেলহত্যা মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

নিম্ন আদালতের রায় বহাল

নিবিড় মাহমুদ

২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল জেল হত্যা মামলার রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ। রায় ঘোষণার আড়াই বছরের বেশি সময় পর গত ১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পূর্ণাঙ্গ রায়টি প্রকাশ করেন। রায় প্রদানকারী অন্য বিচারকরা হলেন– বিচারপতি এস কে সিনহা, বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহহাব মিঞা, বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি মো. ইমান আলী। রায়ের মূল অংশ লেখেন বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেনসহ অন্য চার বিচারক তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। নিম্ন আদালতের রায়ে অন্যতম অভিযুক্ত দফাদার মারফত আলী শাহ ও এল ডি দফাদার আবুল হাসেম মৃধাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে তাঁদের খালাস দেয়া হয়। আর সর্বশেষ আপিল বিভাগের রায়ে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয় তাঁর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে। এই ঘটনায় সেদিন ডিআইজি প্রিজন কাজী আবদুল আওয়াল ৪ নভেম্বর লালবাগ থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন। মামলা দায়েরের ২৩ বছর পর ১৯৯৮ সালের ১৮ আগস্ট সরকার মামলাটি তদন্তের আদেশ দেয়। মামলাটি তদন্তের জন্য সিআইডিতে হস্তান্তর করা হয়। আর তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় এএসপি-সিআইডি আবদুল কাহার আকন্দকে। তদন্ত শেষে একই বছরের ১৫ অক্টোবর ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়।

২০০৪ সালের ২০ অক্টোবর বিচারিক আদালত ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. মতিউর রহমান মামলার রায় দেন। এতে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন (পলাতক), দফাদার মারফত আলী শাহ (পলাতক) ও এলডি দফাদার আবুল হাসেম মৃধাকে (পলাতক) মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হলে ২০০৮ সালে হাইকোর্ট বিভাগ মোসলেমের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে মারফত আলী ও হাশেম মৃধাকে খালাস দেয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট বিভাগের ওই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিলের আবেদন (লিভ টু আপিল) করে। ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চ হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের লিভ টু আপিল আবেদন মঞ্জুর করেন।

হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের ফাঁসির তিন আসামির মধ্যে শুধু দুজনকে খালাস দেওয়ায় রায়ের ওই অংশটির বিরুদ্ধে আপিল করেছিল রাষ্ট্রপক্ষ। পলাতক আসামিদের পক্ষে আপিলের কোনো আবেদন করা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি (বর্তমানে আইনমন্ত্রী) আনিসুল হক যুক্তি দেখিয়েছিলেন, দুই আসামি পলাতক থাকায় রিভিউ আবেদনের সুবিধা তাঁরা পেতে পারেন না।

এই মামলায় বিচারিক আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় সেনা কর্মকর্তা খন্দকার আবদুর রশিদ, শরিফুল হক ডালিম, বজলুল হুদা, এম এইচ এম বি নূর চৌধুরী, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ, এ এম রাশেদ চৌধুরী, আহমদ শরিফুল হোসেন, আবদুল মাজেদ, মো. কিসমত হোসেন, নাজমুল হোসেন আনসার, সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খানকে। ফারুক, শাহরিয়ার রশিদ, বজলুল হুদা ও এ কে এম মহিউদ্দিনকেও খালাস দিয়েছিল হাইকোর্ট বিভাগ। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় এই চারজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ায় আপিল বিভাগের রায়ে তাঁদের শাস্তির ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। এঁদের মধ্যে মেজর আহমদ শরিফুল হোসেন, ক্যাপ্টেন মো. কিসমত হাশেম ও ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার এখনো পলাতক রয়েছেন। এ ছাড়া নিম্ন আদালতের রায়ে খালাস পান বিএনপি নেতা প্রয়াত কে এম ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, সেনা কর্মকর্তা মো. খায়রুজ্জামান ও আজিজ পাশা।

মূল রায়

বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা মূল রায়ে বলেন, এই মামলায় পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে যে, ২ নভেম্বর রাতে রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের সঙ্গে দফাদার মারফত আলী শাহ এবং মো. আবুল হাশেম মৃধা কারাগারে ঢুকেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরো দুই সামরিক বাহিনীর লোক ছিলন। তাঁরা সেখানে তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আওয়ামী লীগের চার নেতাকে হত্যা করেন। হাইকোর্ট বিভাগ এই দুই অভিযুক্তকে নির্দোষ দেখিয়ে ভুল এবং অবিচার করেছে।

বিচারিক আদালতের রায়ে দণ্ডবিধির ১২০খ ধারার অধীনে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এবং পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে অভিযুক্তদের এই অভিযোগ থেকে খালাস প্রদান করা হয়। কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের ডেথ রেফারেন্স ও লিভ টু আপিলের শুনানিতে রাষ্ট্র পক্ষ কিংবা সংক্ষুব্ধ কোনো পক্ষই এই বিষয়ে কিছু বলেন নাই। কিন্তু আপিল শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ আইনজীবী আনিসুল হক এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। তিনি সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদে আপিল বিভাগকে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে

জেল হত্যাকাণ্ডে নিহত চার নেতা

ষড়যন্ত্রের বিচারের সুযোগ রয়েছে বলে আদালতে যুক্তি উপস্থাপন করেন। ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের বিষয়টি বাদ পড়ে যাওয়ার কথা গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে পূর্ণাঙ্গ রায়ে।

বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা বলেন, ফৌজদারি ষড়যন্ত্রে বিচারিক আদালত সব অভিযুক্তকে খালাস দিয়ে দিয়েছিলেন। বিধান অনুসারে আপিলে এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রতিকার চাওয়ার অধিকার ছিল। নিহত নেতাদের পরিবারের কেউ একটা আবেদনের মাধ্যমে সেটা চাইতে পারতেন। কিন্তু সংক্ষুব্ধ কোনো পক্ষই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা সময়ের পরে এই ধরনের কোনো আবেদন করেননি। এমনকি হাইকোর্ট বিভাগে ডেথ রেফারেন্স ও দণ্ডিতদের লিভ টু আপিল শুনানির সময়েও ষড়যন্ত্রের খালাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ কোনো কথা বলেনি, যদিও তারা সেই মামলার শুনানিতে অংশ নিয়েছে। এমনকি আপিলের অনুমতির সময়েও তারা এই প্রশ্নটি তোলেনি। রাষ্ট্রপক্ষ কেবল দফাদার মারফত আলী ও আবুল হাশেম মৃধাকে হত্যার অভিযোগ থেকে খালাসের বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আপিল করেছিল এবং তার ভিত্তিতে আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়। রায়ে বলা হয় যে, কিন্তু শুনানির সময়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী প্রথমবারের মতো ফৌজদারি ষড়যন্ত্র থেকে খালাসের বিষয়ে প্রশ্ন তুলে সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে আপিল বিভাগ অভিযুক্তদের দণ্ড দিতে পারেন বলে মন্তব্য করেন।

'আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ' শিরোনামে সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদে বলা আছে– 'কোনো ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোনো দলিলপত্র উদঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশসহ আপিল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোনো মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ সেইরূপ নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রি বা রিট জারি করিতে পারিবে।'

১০৪ অনুচ্ছেদের প্রয়োগের ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আদালত ভারতীয় মামলা *চন্দ্রকান্তি পাতিল বনাম রাষ্ট্র* (১৯৯৮, ৩ এসসিসি ৩৮) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, দুটি শর্তে সুপ্রিম কোর্ট সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করতে সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। প্রথমত, এটা তখনই প্রয়োগ করা যায় যখন সুপ্রিম কোর্ট তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে আর দ্বিতীয়ত যখন তার সামনে বিবেচনাধীন বিষয় সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য এর প্রয়োগ আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় মাহমুদুল ইসলামের *বাংলাদেশের সাংবিধানিক আইন* বইয়ের ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত করা হয়েছে রায়ে। এ ছাড়াও দেশি-বিদেশি বেশ কয়েকটি মামলার নজির উল্লেখ করে রায়ে আদালত বলেন, 'সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার' মানে এই নয় যে আইনের বিধান উপেক্ষা করে কেবল একটি পক্ষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা কারণ এর ফলে অপর পক্ষের প্রাপ্য আইনের সুবিধাগুলো থেকে তাকে বঞ্চিত করার মত অন্যায় হতে পারে। তাই 'সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার' করার সময় অপর পক্ষের যদি কোনো মূল্যবান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই অধিকারকেও উপেক্ষা করা অনুচিত। আর আপিল বিভাগ কেবল সেই বিষয়গুলোই বিবেচনা করতে পারেন, যেগুলো লিভ টু আপিল আবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষকর্তৃক আদালতে উত্থাপিত যুক্তি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে রায়ে বলা হয়, ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগে আপিলের সময় ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের বিষয়টি আপিলের আবেদনভুক্ত করা হয় নাই। এমনকি আপিল বিভাগে লিভ টু আপিলের আবেদনেও বিষয়টি উত্থাপন করা হয় নাই। সুতরাং ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আপিল বিভাগের সামনে বিবেচনাধীন বিষয় নয়। রাষ্ট্রপক্ষ বা অন্য কোনো সংক্ষুব্ধদের সংবিধিবদ্ধ বিধান অনুসারে ওই খালাস চ্যালেঞ্জ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু তারা সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি। সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের নামে আমরা অভিযুক্তের অধিকার উপেক্ষা করতে পারি না।

তবে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের বিস্তারিত উল্লেখ করে রায়ে বলা হয়– দুই আসামিকে খালাস দিয়ে হাইকোর্ট বিভাগ আইনগত ভুল করেছিলেন। আপিল বিভাগ তাদের খালাস বাতিল করে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন। ■

দ্রুততম সময়ে রাজন ও রাকিব হত্যা মামলা দুটির রায় ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

আতাউল্লাহ্ নুরুল কবীর

এ বছর পরপর কয়েকটি লোমহর্ষক এবং চাঞ্চল্যকর শিশু হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সিলেটে শিশু রাজন হত্যা, খুলনায় শিশু রাকিব হত্যা ও গাইবান্ধায় এমপি লিটনের ছোড়া গুলিতে শিশু সৌরভ আহত হওয়ার ঘটনা অন্যতম।

গত ৮ জুলাই ২০১৫ তারিখে সিলেটের কুমারগাঁওয়ে চুরির অভিযোগ তুলে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয় ১৩ বছরের শিশু রাজনকে। হত্যাকারীরা শুধু নির্মম নির্যাতনে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, পৈশাচিক এ ঘটনাটি তারা ভিডিও করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। ঘটনার পর স্থানীয় জনতা মুহিত আলম নামের একজনকে লাশ গুম করার সময় হাতেনাতে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। রাজন হত্যার ভিডিওটি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে দেশব্যাপী তোলপাড় ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরে পুলিশ বাদী হয়ে ঘটনার হোতা কামরুল ইসলাম ও তাঁর ভাই মুহিত আলমসহ হায়দার আলী ওরফে আলী ও চৌকিদার ময়না ওরফে বড় ময়নার বিরুদ্ধে মামলা করে। যদিও মামলা দায়ের হওয়ার আগেই কয়েকজন পুলিশ সদস্যের সহায়তায় কামরুল ইসলাম সৌদি আরবে পালিয়ে যান। সৌদি আরবের জেদ্দায় বসবাসরত বাঙালিরা কামরুল ইসলামকে আটক করে সৌদি পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন। এ ছাড়া হত্যায় জড়িত অন্য কয়েকজন আসামিকে জনগণ বিভিন্ন স্থান থেকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গত ১৬ আগস্ট পুলিশ ১৩ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। এর মধ্যে দুজন পলাতক ও ঘটনার মূল হোতা কামরুল সৌদি পুলিশের হেফাজতে থাকায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁদের অনুপস্থিতিতেই ২২ সেপ্টেম্বর অভিযোগ গঠন করেন আদালত। ১ অক্টোবর থেকে রাজন হত্যা মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ শুরু হয় এবং মোট ৩৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। পরে ১৫ অক্টোবর মামলার প্রধান আসামি কামরুলকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। ২০ অক্টোবর কামরুলের আইনজীবী আদালতে পুনঃসাক্ষ্য গ্রহণের আবেদন করলে বিচারক ২১ অক্টোবর ১১ জন সাক্ষীর পুনঃসাক্ষ্য গ্রহণ করেন। অভিযোগ গঠনের পর মাত্র ১৭ কর্মদিবসের মধ্যে গত ৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ চাঞ্চল্যকর এই মামলার রায় হয়। মামলার রায়ে প্রধান আসামি কামরুলসহ চারজনের মৃত্যুদণ্ড, একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, তিনজনের সাত বছর কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং দুজনের এক বছর কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া রায়ে তিনজন আসামি খালাস পেয়েছেন।

একই দিনে খুলনায় শিশু রাকিব হত্যা মামলাটিতেও রায় প্রদান করেন আদালত। রায়ে দুজন আসামি ওমর শরীফ ও মিন্টু খানের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। মামলার আরেকজন আসামি, শরীফের মা বিউটি বেগমের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস দেন।

রাকিব খুলনার টুটপাড়ায় অবস্থিত আসামিদের শরীফ মোটর্স নামক মোটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করত। সেখান থেকে কাজ ছেড়ে অন্যত্র কাজ নেয়ায় তার প্রতি ক্ষিপ্ত ছিলেন আসামিরা। গত ৩ আগস্ট বিকেলে উক্ত গ্যারেজের সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আসামিরা তাকে ধরে এনে মোটরসাইকেলে হাওয়া দেওয়ার কম্প্রেসার মেশিনের মাধ্যমে মলদ্বার দিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড বেগে বাতাস দেয়। অতিরিক্ত বায়ুর চাপে রাকিব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাকিবকে নির্যাতনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই গ্যারেজের মালিক ওমর শরীফ ও তাঁর কথিত চাচা মিন্টু খানকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে ক্ষুব্ধ জনতা। পরে শরীফের মা বিউটি বেগমকেও আটক করে পুলিশ। এ ঘটনার পরদিন রাকিবের বাবা মো. নুরুল আলম বাদী হয়ে উক্ত তিনজনের নামে খুলনা সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ২৫ আগস্ট মামলার এজাহারভুক্ত তিন আসামি ওমর শরীফ, মিন্টু খান ও বিউটি বেগমকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ। চার্জশিটে মোট ৪০ জনকে সাক্ষী করা হয়। আদালত এই মামলায় গত ১১ থেকে ১৫ অক্টোবর টানা পাঁচ দিন এবং ২৫ অক্টোবর এ ছয় দিনে মোট ৩৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং ১ নভেম্বর যুক্তিতর্ক শুনানি হয়।

সাধারণত আমাদের দেশে একেকটি ফৌজদারি মামলা শেষ হতে বছরের পর বছর সময় পার হয়ে যায়। তবে এ ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ে গত ৮ নভেম্বর সিলেট ও খুলনায় শিশু রাজন ও রাকিবের হত্যা মামলা দুটিতে রায় হওয়ার খবর উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু একই দিনে গাইবান্ধার শিশু সৌরভকে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি এমপি লিটন দ্রুত জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর অনুগত নেতা-কর্মীরা যেভাবে ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেন, তা সাধারণের মনে আশঙ্কা জাগায় ও ভীতির সঞ্চার করে।

গত ২ অক্টোবর গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য লিটনের ছোড়া গুলিতে শাহাদাত হোসেন সৌরভ নামে নয় বছর বয়সি ওই শিশু আহত হয়। দুই পায়ে তিনটি গুলির ক্ষত নিয়ে দীর্ঘদিন তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়। তার বাবা সাজু মিয়া ঘটনার পরদিন সাংসদ লিটনকে আসামি করে সুন্দরগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। সৌরভ হত্যাচেষ্টা মামলায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ গত ১৪ অক্টোবর রাতে রাজধানীর উত্তরার বোনের বাসা থেকে লিটনকে গ্রেফতার করেছিল।■

‘অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন’ ও আইনের কিছু দিক

সমীর কর্মকার

গত ১৯ অক্টোবর টানা ৩৮ দিন কারাবাসের পর জামিনে মুক্তি পেলেন অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চার কর্মী। তাঁরা হলেন সংগঠনটির চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জাকিয়া সুলতানা, ফিরোজ আলম খান ও হাসিবুল হাসান। পুলিশ গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ঢাকার রামপুরায় অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন পরিচালিত শেল্টারহোম থেকে এই চারজনকে আটক করে। এই ঘটনার আইনি কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার আগে জানা জরুরি, এই চার তরুণের উদ্দেশ্য ও তাঁদের গড়ে তোলা সংগঠনটির লক্ষ্য। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও অদম্য ফাউন্ডেশনের গঠনতন্ত্র থেকে জানা যায়, এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যা ছিন্নমূল পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে। জানুয়ারি, ২০১৩ কয়েকজন তরুণ-তরুণী মিলে ছিন্নমূল পথশিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন। তাঁরা ঢাকার তিনটি স্থানে তিনটি অস্থায়ী স্কুল গড়ে তোলেন এবং এই শিশুদের নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। শুরুতে সংগঠনটির কোনো ধরনের নিবন্ধন না থাকলেও বিগত ২৯ জানুয়ারি, ২০১৫ রেজিস্টার জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে সামাজিক সংগঠন নিবন্ধন আইন, ১৮৬০ অনুসারে নিবন্ধিত হয়। যার ফলে স্বেচ্ছাসেবামূলক ও জনকল্যাণকর কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সংগঠনটির আইনি ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়।

পথশিশুদের জন্য একটি স্থায়ী শেল্টার হোম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ঢাকার রামপুরায় ছেলে-শিশুদের জন্য একটি অস্থায়ী শেল্টার হোম প্রতিষ্ঠা করে। শেল্টার হোম প্রতিষ্ঠার পেছনে সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল– যেসব পথ শিশুর নির্দিষ্ট কোনো থাকার জায়গা নেই, শিক্ষার বন্দোবস্ত নেই কিন্তু লেখাপড়া শেখবার ইচ্ছা আছে, তাদের শেল্টার হোমে তিন বছরের জন্য আশ্রয় দিয়ে খাদ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এর মধ্যে কোনো শিশুর অভিভাবকের পরিচয় পাওয়া গেলে তাকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা। এ লক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের অস্থায়ী শেল্টার হোমে প্রাথমিকভাবে ১০ জন পথশিশুকে আশ্রয় প্রদান করেন। রামপুরার এই শেল্টার হোমে গত ১২ সেপ্টেম্বর অভিযান চালায় পুলিশ এবং কোনো ধরনের কারণ উল্লেখ না করেই ওখানে উপস্থিত চারজনকে গ্রেফতার করে। এরপর গ্রেফতারকৃতদের মানবপাচারকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২-এর ১০(১) ধারায় মামলা দায়ের করে। গ্রেফতার করার পরদিনই তাঁদের আদালতে উপস্থিত করে অধিকতর তদন্তের জন্য রিমান্ড আবেদন করা হলে আদালত দুই দিনের রিমান্ড শেষে আসামিদের কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করে। এখন প্রশ্ন হলো পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার, মামলা দায়ের ও রিমান্ড গ্রহণের

কারা-মুক্তির পর অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের কর্মীরা

প্রক্রিয়া কতখানি যুক্তিযুক্ত ছিল। গ্রেফতার প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানে বলা হয়েছে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই তাদের গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। কিন্তু একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকাকে ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা বলেন, ‘পুলিশ গ্রেফতার করার সময় গ্রেফতার করার কারণ-সম্পর্কিত কোনো তথ্য তাঁদের প্রদান করেনি।’ যা সরাসরি সংবিধানের ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

এ ছাড়া অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের গ্রেফতারকৃত সদস্যরা জামিনে মুক্তি লাভের পর, গত ১৯ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিককে বলেন, গ্রেফতার হওয়ার বেশ কিছু দিন আগেই তাঁরা সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠনটির নিবন্ধন-সম্পর্কিত কাগজপত্র রামপুরা থানায় প্রদান করেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর গ্রেফতারের আগের দিন সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেল্টার হোম পরিদর্শনে গিয়ে সেখানে থাকা শিশুদের খোঁজখবরও নেন। এরপর ১২ সেপ্টেম্বর এই পরিদর্শনের পরদিন দুপুর সাড়ে ১২টায় কোনো কারণ উল্লেখ না করে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে এবং ওই দিনই মো. মনির হোসেন বাদী হয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় গ্রেফতারকৃত চারজনকে আসামি করে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২-এর ১০(১) ধারায় মামলা দায়ের করেন। আইনটির ১০(১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি মানবপাচারের অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নসহ এই আইনের বর্ণিত অন্য কোনো শোষণের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে অপহরণ,

গোপন অথবা আটক করে রাখলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে ভাবা যেতে পারে যে, বিগত ১১ সেপ্টেম্বর পরিদর্শনের পর আলোচ্য আইনের ১৮ ধারা অনুসারে পুলিশের যুক্তিসংগত সন্দেহ হয়েছে, সংগঠনটি মানবপাচারের উদ্দেশ্যে শিশুদের আটকে রেখেছে এবং পরবর্তী সময়ে বিবাদীর করা অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেফতার করেছে। এ ক্ষেত্রে ১৮ ধারায় কী আছে তা জানা জরুরি। আলোচ্য ধারা অনুসারে, 'কোনো ব্যক্তির হেফাজত থেকে অথবা তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকা কোনো স্থান থেকে মানবপাচার অপরাধের শিকার কোনো ব্যক্তিকে অথবা মানবপাচার অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত কোনো কিছু উদ্ধার করা হলে এবং ওই ব্যক্তিকে যদি মানবপাচারকারী হিসাবে যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহ হয় অথবা তিনি যদি উদ্ধারকৃত ভিকটিম কর্তৃক মানবপাচারকারী হিসাবে চিহ্নিত হন, তবে ভিন্ন কিছু প্রমাণ না হলে তিনি মানবপাচার করেছেন বলে অনুমান করা যাবে।' কিন্তু ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গ্রেফতার হবার বেশ কিছুদিন আগেই সংগঠনটি তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার বৈধ নিবন্ধনসংক্রান্ত কাগজপত্র থানায় জমা দিয়েছে এবং থানা থেকে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মৌখিক অনুমতিও গ্রহণ করেছে। তাই ধারা ১৮ অনুসারে তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুরা মানবপাচারের শিকার– এই ধরনের অনুমান করা আইনসংগত নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, পুলিশ শুধু বিবাদীর অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই চার মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। বিবাদীর করা অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, বিবাদী গত ১২ সেপ্টেম্বর জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে জানতে পারে, তার ভাতিজা রামপুরা থানাধীন বনশ্রীস্থ বাসায় আটক আছে এবং এই সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ও জনসাধারণের সহায়তায় উক্ত বাসা থেকে মানবপাচারের শিকার শিশুদের উদ্ধার করে। কিন্তু বৈধ কাগজপত্র প্রদান ও পুলিশ পরিদর্শনের পর শুধু জনৈক ব্যক্তির সংবাদের ওপর ভিত্তি করে মানবপাচারের মতো অভিযোগে গ্রেফতার করা কোনোভাবেই যুক্তিসংগত ও আইনানুগ নয়। মামলা আমলে নিয়ে অভিযোগ গঠনের সময় আদালত প্রাথমিক তথ্য বিবরণী, সাক্ষীদের বক্তব্য, অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের বক্তব্য এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণ করবেন। তা ছাড়া আদালত রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করার সময় অবশ্যই বিচারিক মনোভাব (Judicial mind) প্রয়োগ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য আমলে নিয়ে মামলা তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করলে তবেই রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করবেন। তবে ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের বক্তব্য অনুযায়ী আদালত তাঁদের কোনো বক্তব্য না শুনেই তাঁদের জামিন আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে প্রত্যেককে দুই দিনের জন্য রিমান্ডে প্রেরণ করে। এখানে প্রশ্ন– এই মামলায় আসলেই কি রিমান্ডের প্রয়োজন ছিল? আইন অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, শুধু সে ক্ষেত্রেই অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনে আদালত রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করে। কিন্তু এই মামলায় পুলিশ উদ্ধারকৃত শিশুদের ভাষ্য ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ঘটনার তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারত, সে ক্ষেত্রে আলাদা করে রিমান্ডে নেওয়া আইনি কোনো যৌক্তিকতা ছিল না।

উক্ত ঘটনার পর গ্রেফতারকৃতদের পক্ষে আরো চার বার জামিন আবেদন করা হয় কিন্তু প্রত্যেকবারই আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে দেন। সর্বশেষ বিগত ১৩ অক্টোবর আদালত তাঁদের জামিন আবেদন নাকচ করার পরদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে লেখা একটি খোলা চিঠি ঘটনাটির সামগ্রিক অবস্থাকেই পাল্টে দেয়। সামাজিক মাধ্যমে লেখা চিঠিতে কমেন্ট করে, সহায়তার আশ্বাস দেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব। এই ঘটনার পরদিনই পুলিশ দীর্ঘ এক মাস তদন্ত শেষে আদালতে মামলাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান করে এবং একই দিনে আদালত গ্রেফতারকৃত চার তরুণকেও জামিনে মুক্তি দেন। পুলিশের দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রসঙ্গে আসামিপক্ষের আইনজীবী বলেন, 'অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ছিন্নমূল শিশুদের নিয়ে কাজ করে আসছে। যে ১০ শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে তারাও ছিন্নমূল পথশিশু। উক্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবপাচারের অভিযোগ নেই।' অর্থাৎ– দীর্ঘ এক মাস তদন্তের পর পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো তথ্যপ্রমাণ পায়নি। ■

তথ্যসূত্র

১. *প্রথম আলো*, ১৪ অক্টোবর ২০১৫
২. মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২
৩. *The daily Dhaka Tribune*, ১৪ অক্টোবর ২০১৫

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির সাজার মেয়াদ থেকে হাজতবাসের সময়কাল বাদ দেয়া প্রসঙ্গে হাইকোর্টের রুল

অবন্তী নুরুল

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কোনো দণ্ডিত ব্যক্তির কারাদণ্ডের মেয়াদ থেকে সাজা-পূর্ববর্তী হাজতবাসের সময় বাদ দেবার বিধান থাকলেও কারাগারগুলোতে এমন অনেক দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি রয়েছেন, যাঁদের কারাদণ্ডের মেয়াদ থেকে তাঁদের হাজতবাসের সময় বাদ দেয়া হচ্ছে না। গত ২৭ মে ২০১৫ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত "বিনা বিচারে অনেক দরিদ্র নারী কারাবন্দি" প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়, সিলেট কারাগারে এমন অনেক নারী আটক রয়েছেন যাদের অন্যায়ভাবে মামলায় জড়ানো হয়েছে। গত ১২জুন ২০১৫ তারিখ প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আসক-এর নির্বাহী পরিচালকসহ চার সদস্যের একটি

স্থানীয় সরকার

এম মনসুর আলী

স্থানীয় সরকার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। মূলত রাষ্ট্রের সামগ্রিক কাজের সমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে সদা ব্যস্ত থাকতে হয় বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সব সময় নিম্নস্তর পর্যন্ত নজরদারি করা সম্ভব হয় না। যার ফলে রাষ্ট্রের কর্তব্য, দায়িত্ব বা সরকারি নীতি কার্যকর করার জন্য কাজ ও ক্ষমতার বিভাজন করা হয়, গঠিত হয় স্থানীয় সরকার।

বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় 'কেন্দ্রীয় সরকার' প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় না। বিদ্যমান ব্যবস্থায় 'স্থানীয় সরকার' নামে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনকে বোঝানো হলেও প্রকৃত অর্থে এগুলো বাংলাদেশ সরকারের নির্বাহী বিভাগের স্থানীয় শাখা হিসেবে কাজ করছে মাত্র।

স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকেই বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম চলে এলেও বাস্তবতা আসলে ভিন্ন। ২০০৮ সালে চার সিটি করপোরেশনে নির্বাচন একসঙ্গে করার অভিজ্ঞতার পর তখনকার নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছিলেন, নির্দলীয় স্থানীয় সরকার নির্বাচন কেবল আইনের পাতাতেই আছে। প্রকারান্তরে দলীয় নির্বাচনই তো হচ্ছে। দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে যে-কোনো সমস্যার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য দায়ী করা যায়।

এ বছর ১২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশনের নির্বাচন আইন সংশোধনের খসড়ায় নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে মেয়র, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে দলীয় মনোনয়ন ও প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। উক্ত বৈঠকে স্থানীয় সরকারের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সংশোধন আইন একযোগে অনুমোদন করা হয়। এ আইনগুলো হচ্ছে– স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধন আইন, ২০১৫; উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫; জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) সংশোধন আইন, ২০১৫ ও স্থানীয় সরকার (সিটি

প্রতিনিধিদল সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে গেলে সিলেট কারা কর্তৃপক্ষ জানায় যে, সেখানে এমন নারী বন্দি না থাকলেও ৪৩জন বন্দি রয়েছেন যারা ফৌজদারি কার্যবিধীর ৩৫ক ধারার বিধান অনুসারে কারাদণ্ডের মেয়াদ থেকে হাজতকালীন সময় বাদ দেয়ার সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫ক ধারার বিধান অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো অপরাধে বিচার চলাকালীন কোনো আসামি হাজতে থাকলে তার হাজতবাসকালীন কারাদণ্ড ভোগের সময় থেকে বাদ যাবে। কেননা এই হাজতবাসের সময়টি কারাদণ্ডের সময় হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু সিলেট কারা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই বিচারিক আদালতের রায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির সাজার মেয়াদ থেকে হাজতবাসের সময় বাদ যাবার বিষয়টি উল্লেখ থাকে না। ফলে কারা-কর্তৃপক্ষও দণ্ডিত ব্যক্তির সাজার মেয়াদ থেকে হাজতবাসের মেয়াদ বাদ দেয় না। সিলেট কারাগারে আটক এই ৪৩জন কারাবন্দির মধ্যে অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫ক ধারার এ সুবিধা পেলে এত দিনে মুক্তি পেয়ে যেতেন। কিন্তু এই ধারাটির প্রয়োগ না করায় তাঁরা যেমন একদিকে কারাগার থেকে বের হতে পারছেন না, অপরদিকে আরো অনেক দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি রয়েছেন, যাঁদের কারাদণ্ডের মেয়াদ ৩৫ক ধারার সুবিধাপ্রাপ্তির কারণে হ্রাস হবার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। শুধু সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারই নয়; বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারেই এমন অনেক বন্দি আছেন বলে জানা যায়।

আসক মনে করে, আইন অনুসরণ না করে কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখা একদিকে যেমন ওই ব্যক্তির আইনগত অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে তেমনি এটি তাঁর সাংবিধানিক অধিকারেরও চূড়ান্ত লঙ্ঘন ঘটায়। ফলে, আইনের সুবিধাবঞ্চিত এ সকল ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং আইনের প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করতে আসক এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এবং ওই ৪৩ জন ব্যক্তির তালিকা সংগ্রহের পর হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, কারা মহা পরিদর্শক, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার এবং জেলারকে বিবাদী করে মামলাটি দায়ের করা হয়। ৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে মামলাটির প্রাথমিক শুনানি শেষে মাননীয় বিচারপতি জনাব কাজী রেজাউল হক ও মাননীয় বিচারপতি জনাব আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির সাজার মেয়াদ থেকে হাজতবাসের সময় বাদ দেয়া সংক্রান্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫ক ধারাটি অনুসরণ না করা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না– তা জানতে চেয়ে সরকারের প্রতি রুল জারি করেন রুল জারির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন কারাগারে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫ক ধারার সুবিধাবঞ্চিত কত জন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রয়েছেন, তাঁদের একটি তালিকা আদালতে দাখিল করতে স্বরাষ্ট্রসচিব ও কারা মহাপরিদর্শককে নির্দেশ দেন আদালত। তা ছাড়াও বিভিন্ন কারাগারে সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরও কতজন বন্দি আটক রয়েছেন, তারও তালিকা আদালতে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ■

করপোরেশন) সংশোধন আইন, ২০১৫। কিন্তু পরবর্তীতে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংসদ থেকে 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫' বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তৎকালীন সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় মনোনয়নে হয়। সেখানে চাইলে নির্দলীয় প্রার্থীরাও নির্বাচন করতে পারেন। আমাদের এখানেও তা-ই করার প্রস্তাব এসেছে, মন্ত্রিসভা তা অনুমোদন দিয়েছে। নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহৃত হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিয়মেই নির্বাচন হবে। নির্দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগও থাকছে। এ কারণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির আরো বিকাশ ঘটবে বলে জানান তিনি। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'ইউনিয়ন পরিষদের ২৬(১) ধারায় নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে, নতুন আইনে সেখানে আরেকটি যোগ্যতা যোগ করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে– প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হতে হবে অথবা নির্বাচনী এলাকার ১ শতাংশ ভোটারের লিখিত সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে হবে।'

সংশোধনী অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। যদি কোনো কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হয়, তা হলে পরিষদ ভেঙে দিয়ে অন্তবর্তী সময়ের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করা হবে। এই বিধান আগে শুধু 'সিটি করপোরেশন আইন'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু এখন ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও সরকার প্রশাসক নিয়োগ দিতে পারবে। পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক দায়িত্ব পালন করবেন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় নির্দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান বাদ দিয়ে দলীয় পরিচয়ে ও প্রতীকে নির্বাচনের পক্ষে সরকার যেসব যুক্তি দেখিয়েছে সেগুলো হলো–

ক. গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী করা। খ. স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সংঘাত-সহিংসতার পথ বন্ধ করা। গ. স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো যেন তাদের সমর্থিত প্রার্থীর জন্য ভোট চাইতে পারে, সেই বিধানকে আইনসম্মত করা। ঘ. সংসদীয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার ব্রিটেন ও পৃথিবীর বৃহত্তম সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ ভারতের মতো আমাদের স্থানীয় সরকারভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন দলীয় পরিচয় ও প্রতীকে অনুষ্ঠান করা।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয়ভাবে নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে গত ১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো নির্দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যখন হিসাব করা হয় তখন দলের নামেই হিসাব করা হয়, যেমন- কোন দল কতটাতে হারল, কতটাতে জিতল, কে কয়টা পৌরসভা পেল ইত্যাদি। যদি দলীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি কী কী কাজ করছেন, তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ ব্যাপারে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ টি এম শামসুল হুদা বলেন, 'ভারতের পঞ্চায়েতসহ সব স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয়ভাবে করা হয়। আপনি এটাকে (স্থানীয় সরকার নির্বাচন) বলবেন নির্দলীয়, আবার অংশ নেবেন দলীয়ভাবে, এটা তো হতে পারে না। পারস্পরিক এই বিরোধ রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।'

মন্ত্রিসভায় খসড়া পাস হওয়ার পর দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি দলীয় মনোনয়ন এবং প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের উদ্যোগকে সরকারের দুরভিসন্ধি হিসেবে আখ্যায়িত করে। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মুখপাত্র সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেন, দলীয় মনোনয়ন এবং প্রতীকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় নির্বাচন রাষ্ট্র ও সমাজে বিভাজন তৈরি করবে।

অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনার পর ২২ নভেম্বর রাতে দশম সংসদের অষ্টম অধিবেশনে সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নে শুধু মেয়র ও চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের বিধান রেখে স্থানীয় সরকারের তিনটি বিল পাস করেছে জাতীয় সংসদ। এর আগে ১৫ নভেম্বর শুধু মেয়র পদে নির্বাচনের বিধান রেখে 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) সংশোধন আইন, ২০১৫' পাস হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, আইনটিতে ২০০৯ সালের আইনের ২ অনুচ্ছেদে ৫৫(ক) ধারা প্রতিস্থাপন করে তাতে 'রাজনৈতিক দল' শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ২ ধারায় 'নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল' শব্দ সংযুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া ৬১ ধারায় ৬১(ক) নামে একটি উপধারা সংযোজিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কোনো রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত নয়, এমন কোনো প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন।

আগামী ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৫ মোট ২৩৪টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গত ২৪ নভেম্বর, ২০১৫ তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার বা সমমর্যাদার সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে পারবেন না। তবে এঁদের কেউ কোনো পৌরসভার ভোটার হলে ভোট দিতে এলাকায় যেতে পারবেন।

নির্বাচন পরিচালনা বিধিতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দলের প্রধান বা সাধারণ সম্পাদক, অথবা তাদের মনোনীত কোনো ব্যক্তি (মনোনয়ন কর্তৃপক্ষ) চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। সে ক্ষেত্রে দল থেকে মনোনয়ন চাওয়া অন্য প্রার্থীদের প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যাবে। কমিশনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, তফসিল ঘোষণার তিন দিনের মধ্যে রাজনৈতিক দলকে মনোনয়ন কর্তৃপক্ষের নাম ঘোষণা করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামি লীগ থেকে তাদের প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়ন দিবেন দলটির সভানেত্রী শেখ হাসিনা, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ শাহজাহান নিজ দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন দিবেন এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মনোনয়ন দিবেন দলটির প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। আর জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন না থাকায় তারা স্বতন্ত্র প্রার্থী রাখার ঘোষণা দিয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল নির্বাচনের তারিখ পেছানোর আবেদন করলেও কমিশন তা আমলে নেয়নি। ■

পিতার বিরুদ্ধে অবিবাহিত কন্যার ভরণপোষণের ডিক্রি লাভ

ফারহানা আফরোজ

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বিবাহিত হিন্দু নারীর পৃথক বসবাস, সন্তানের ভরণপোষণ প্রভৃতি বিষয়ে পারিবারিক আদালতের বিভিন্ন মামলায় আইন সহায়তাপ্রার্থীদের দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতা করে আসছে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর ৫ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে বসবাসকারী যে-কোনো ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ এ আইনে পাঁচটি বিষয়ে প্রতিকার পেয়ে থাকে। ১. বিবাহবিচ্ছেদ, ২. দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, ৩. দেনমোহর, ৪. ভরণপোষণ, ৫. সন্তানের অভিভাবকত্ব ও হেফাজত।

এই আইনের ৫ ধারায় ভরণপোষণের বিষয়ে বলা হয়েছে– স্বামী বিবাহিত স্ত্রীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভরণপোষণ, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ এবং পিতা, নাবালক সন্তান, শারীরিকভাবে অসমর্থ্য সন্তান এবং অবিবাহিত কন্যার ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। এমনকি বৃদ্ধ, অসমর্থ্য পিতা-মাতাও সামর্থ্যবান পুত্রের নিকট ভরণপোষণ দাবি করতে পারে। বর্তমানে অবশ্য পিতা-মাতার ভরণপোষণ, ২০১৩ নামে পৃথক আইন প্রণীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হিন্দু নারীর ভরণপোষণ, সন্তানের ভরণপোষণ এবং পৃথক বসবাসের বিষয়টি আলোচনার যোগ্য। বাংলাদেশে হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদের বিধান না থাকায় ১৯৪৬ সালের বিবাহিত হিন্দু নারীর পৃথক বসবাস-সংক্রান্ত আইনের মাধ্যমে পারিবারিক আদালতে বিবাহিত হিন্দু নারী পৃথক বসবাসের আবেদন করতে পারেন। এ ছাড়াও হিন্দু পারিবারিক আইনে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী– নাবালক ছেলে, অবিবাহিত কন্যা এবং বাবা-মা। হিন্দু আইন অনুযায়ী একজন কর্তা যৌথ পরিবারের সকল পুরুষ, তাঁদের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। বর্তমানে সে অর্থে যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব না থাকায় একক পরিবারের উপার্জনক্ষম প্রধান পুরুষ ব্যক্তি ওই পরিবারের অন্য সদস্যদের ভরণপোষণ দেবেন। এমনকি অক্ষমতা বা অযোগ্যতা হেতু কেউ পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত থাকলে তাকে ও তার পরিবারকে অক্ষম ব্যক্তির বাবা ও বাবার অবর্তমানে বাবার উত্তরাধিকারী যথাযোগ্য ভরণপোষণ দিতে বাধ্য।

সম্প্রতি আসক অবিবাহিত হিন্দু নারীর পক্ষে ১৯৮৫ সালের পারিবারিক অধ্যাদেশ অনুযায়ী পিতার বিরুদ্ধে ভরণপোষণ দাবি করে মামলা দায়ের করে। মামলার ঘটনায় দেখা যায়, অনিতা রায় (ছদ্মনাম) গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে চাকরির চেষ্টা করছেন। ১৯৯৬ সালে তাঁর মা মারা যান। অনিতা ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট। তাঁর বড় ও মেজো বোন বিবাহিত। মা মারা যাওয়ার পর অনিতার বাবা তাঁদের মাতৃস্নেহে লালন-পালন করতেন। কিন্তু ২০০২ সালে দ্বিতীয় বিয়ে করার পর সন্তানদের সাথে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে তা মানসিক নির্যাতনে রূপ নেয়। অনিতার বাবা ও সৎমায়ের অত্যাচারে অনিতার বড় ভাইবোন বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এমনকি তাদের দুর্ব্যবহারের কারণে অনিতার পিসি, মামাসহ অন্য আত্মীয়স্বজনও অনিতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। অনিতা তাঁর বাবার কাছে পড়াশোনার খরচ চাইলে তিনি প্রচণ্ড খারাপ ব্যবহার করতেন। তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করে আত্মীয়স্বজন ও ভাইবোনদের সহযোগিতায় এইচএসসি পাস করে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় ঢাকায় বোনের বাসায় চলে আসেন।

অনিতা তাঁর মামা, বোন ও জামাইবাবুর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে অনার্সে ভর্তি হন। ভর্তির সময় তাঁর বাবা ও সৎমা তাঁকে সহযোগিতা করেননি। পরে তাঁর বাবা মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতেন। সেই টাকা এত সামান্য যে, পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য অনিতাকে তাঁর বোন ও অন্যান্য আত্মীয়দের কাছে হাত পাততে হতো। যদিও অনিতার বাবা একজন সচ্ছল ব্যবসায়ী।

একসময় আর্থিক টানাটানিতে অনিতার পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অনিতা বাধ্য হয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রে (আসক) তাঁর পিতার বিরুদ্ধে ভরণপোষণের দাবিতে অভিযোগ করেন। পরবর্তী সময়ে আসক-এর সহযোগিতায় সালিশের মাধ্যমে অনিতার বাবা প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা ভরণপোষণ দিতে সম্মত হন। দুটি কিস্তি প্রদানের পরে তিনি ভরণপোষণ দেয়া বন্ধ করে দেন। ফলে অনিতার লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫-এর মাধ্যমে পারিবারিক আদালতে অনিতার ভরণপোষণ দাবি করে অনিতার বাবা ও তাঁর সৎমায়ের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালের ১৮ আগস্ট মামলা দায়ের করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।

বিজ্ঞ আদালত অনিতার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং ২০১৫ সালের ২৭ জুলাই বকেয়া ভরণপোষণ বাবদ ৪ লাখ ২ হাজার টাকা এবং তাঁর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে প্রদানের আদেশ দেন। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে অনিতার বাবা টাকা প্রদান না করায় গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) অনিতার পক্ষে ডিক্রি জারি মামলা দায়ের করে। উল্লেখ্য যে, ডিক্রি জারির মাধ্যমে টাকা আদায় অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং আইনি জটিলতায় টাকা আদায় প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়। এ ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করার পর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ পর্যন্ত আইন সহায়তাপ্রার্থী অনেক সময় হতাশ হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতায় এইটুকু বলা যায় যে, অনিতার ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনি কিছু প্রক্রিয়ার পর ডিক্রির টাকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তাও রয়েছে। ■

আদালতের আদেশ অমান্য করায় স্ত্রীর হাজতবাস

মিজানুর রহমান

ফৌজদারি আদালতে মামলা দায়ের করা হলে সাধারণত অপরাধের ধরন অনুযায়ী অপর পক্ষকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী আদালত কখনো কখনো কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণের আদেশ প্রদান করে থাকেন। ব্যক্তি যদি উক্ত আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত তারিখে আদালতে হাজির না হন, তাহলে তাঁকে হাজতবাস করতে হয়। তেমনই একটি ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল আসমার জীবনে।

আসমা বেগম (ছদ্মনাম)। বয়স ৩০ বছর। জহির মিয়ার (ছদ্মনাম) দ্বিতীয় স্ত্রী তিনি। ২০১০ সালে জহির মিয়া রেজিস্ট্রি কাবিনমূলে তাঁকে বিয়ে করেন। এটি আসমা বেগমের প্রথম বিয়ে। আর জহির মিয়ার এটি দ্বিতীয় বিয়ে এবং তাঁর আগের সংসারের সন্তান আছে।

জহির মিয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে চাকরি করেন এবং মোটা অঙ্কের বেতন পান। তাঁর অর্থসম্পদের অভাব নেই। দু-চারটে বিয়ে করার মাঝে তিনি অন্যায়ের কিছু খুঁজে পান না। আসমাকে বিয়ে করার পর চার বছর জহির মিয়া তাঁকে নিয়ে সংসার করেন। ইতিমধ্যে ২০১১ সালে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়। সন্তানটি বর্তমানে তার বাবার হেফাজতে আছে।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই আসমার স্বামী তাঁর সঙ্গে তুচ্ছ কারণে ঝগড়া-বিবাদ করতেন। তাঁর কাছে টাকা দাবি করতেন এবং মিথ্যা বদনাম দিতেন। আসমা প্রতিবাদ করলেই তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন। তার পরও আসমা সন্তান, সংসার ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সংসার করে যান। দিনে দিনে তাঁর স্বামী আরো হিংস্র হয়ে ওঠেন। তাঁকে শারীরিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন হুমকি প্রদর্শন করা অব্যাহত রাখেন। ফলে আসমা ১২.০৩.২০১৩ তারিখে সন্তানসহ তাঁর বাপের বাড়ি চলে আসেন। এর ১৫ দিন পর আসমার স্বামী ও শাশুড়ি তাঁর বাপের বাড়ি আসেন এবং তাঁর সন্তানকে বেড়ানোর কথা বলে নিয়ে যান। তাঁরা তাকে আর ফেরত দেননি। এরপর আসমা তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানায় বিভিন্ন তারিখে তিনটি জিডি (১. জিডি নং-৩০৯৪, তাং-৩১.০৩.২০১৩; ২. জিডি নং-২১৮, তাং-৩.১১.২০১৪; ৩. জিডি নং-১৪৬৮, তাং-২৪.০৭.২০১৫)-সহ উত্তরা পশ্চিম থানায় দুটি জিডি (১. জিডি নং-১৪৩, তাং-০৩.২.২০১৫; ২. জিডি নং-১১৩৬, তাং-১৬.১১.২০১৪) দায়ের করেন।

আসমার বাবা জীবিত নেই। তাঁরা দুই বোন। বোনের মধ্যে তিনি বড়, ছোট বোন স্বামীসহ নিউজিল্যান্ড প্রবাসী। মা-ও তাঁর সন্তান দেখাশোনার জন্য নিউজিল্যান্ড আছেন। বর্তমানে বাড়িতে আসমা একা। তাঁর স্বামী এসে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন ও মারধর করেন। স্বামীর অত্যাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি একটি আবাসিক ছাত্রী হোস্টেলে চলে আসেন। তাই তাঁর স্বামী কৌশলে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ২৬.০৮.২০১৫ তারিখে আসমার বিরুদ্ধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা

দেনমোহর ও ভরণপোষণের মামলায় শ্বশুরের বিরুদ্ধে ডিক্রি

আতাউল্লাহ্ নুরুল কবীর

মুসলিম আইন অনুযায়ী দেনমোহর স্ত্রীর কাছে স্বামীর একটি ঋণ, তবে তা সাধারণ ঋণের মতোই একটি অনিশ্চিত ঋণ। মৃত ব্যক্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের ব্যক্তিগতভাবে এই ঋণের জন্য দায়ী করা যায় না। তবে অন্যান্য ঋণের মতো দেনমোহরের ঋণের ক্ষেত্রেও মৃতের সম্পত্তির প্রত্যেক উত্তরাধিকারী প্রাপ্য অংশের আনুপাতিক হারে মৃতের প্রদেয় দেনমোহর পরিশোধের জন্য দায়ী হবে। সাধারণভাবে দেনমোহরের দাবি মৃতের কোনো সুনির্দিষ্ট সম্পত্তিতে চার্জ সৃষ্টি করতে পারে না। তবে যদি কোনো সম্পত্তি মৃতের স্ত্রীর বৈধ দখলে থাকে, তাহলে সেই সম্পত্তির আয় থেকেদেনমোহরের টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সে তা দখলে রাখতে পারবে। আবার স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রদানের জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যায় না। সুতরাং, আইনগত কারণে স্ত্রীর পক্ষে দেনমোহর ও ভরণপোষণ-সংক্রান্ত মামলায় স্বামী ছাড়া অন্য কারো বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়া অনেক কঠিন। তবে সম্প্রতি আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সোনিয়া চৌধুরী বনাম দেওয়ান আশরাফ আলী নামের দেনমোহর ও ভরণপোষণের মামলায় একটি ভিন্নধর্মী রায় পেয়েছে। রায়ে মৃত পুত্রের প্রদেয় দেনমোহর, ভরণপোষণ পিতা কর্তৃক পরিশোধের আদেশ দেয়া হয়েছে।...

সোনিয়া চৌধুরীর (২৭) সঙ্গে গত ১৪ মে ২০০৮ তারিখে বিয়ে হয় সুইডেন প্রবাসী দেওয়ান আফজাল হোসেনের। তাঁদের বিয়ের দেনমোহর ধার্য হয়েছিল ১৫ লাখ টাকা, যার মধ্যে ১ লাখ

১০৭-এর অধীনে একটি পিটিশন মামলা (মামলা নং-২০৭(ক)/২০১৫) দায়ের করেন। মামলার বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ :

'(ক) মামলার বাদী/ প্রথম পক্ষ সহজ সরল শান্তিপ্রিয়, আইন মান্যকারী ও বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক ও চাকরিজীবী বটে, পক্ষান্তরে মামলার দ্বিতীয় পক্ষ অত্যন্ত জুলুমবাজ, অত্যাচারী ও আইন ভঙ্গকারী লোক হইতেছে বটে। (খ) বিয়ের শুরু থেকেই আসমা সংসারে অনাসক্ত থাকে এবং বেপরোয়া ও উচ্ছৃখল জীবন যাপন করে এমন কি শিশু পুত্র জন্মের পরও তা অব্যাহত রাখে। বিগত ৩০/৮/২০১৪ তারিখে বাদীকে আসমা তালাক দেয়। (গ)

আসমা বিবাহ বিচ্ছেদের পর আরো বেপরোয়া জীবন শুরু করে। পৈত্রিক সূত্রে ঢাকায় নিজস্ব বাড়ি থাকার পরেও অসৎ সঙ্গ জীবন কাটায় ও চিহ্নিত মাদক সেবী ও বখাটেদের সাথে চলাফেরা করে। নিজস্ব বাড়িতে না থেকে অসামাজিক জীবনের সুবিধার জন্য হোস্টেলে অবস্থান করে। (ঘ) বিভিন্ন সময় আসমা তাকে মানসিক অত্যাচার ও গালমন্দ করে এবং মিথ্যা মামলা সৃজন করার হুমকি দিয়ে এবং শিশু পুত্রের ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে আর্থিক সুবিধাদি আদায় করে। (ঙ) গত ২০/৪/২০১৫ তারিখে সন্ত্রাসীসহ হামলা, শরীর সম্পত্তি ক্ষতি করার প্রকাশ্য হুমকী দিলে বাদী দরখাস্তকারী গুলশান একটি জিডি (জিডি নং- ১২৬৪) দায়ের করে। (চ) এরপরও আসমা বাদী ও তার পুত্রের শারীরিক ক্ষতি সাধন করা সহ মিথ্যা মামলায় জড়ানোর হুমকি দেওয়া অব্যাহত রাখে। (ছ) গত ২০/৮/২০১৫ তারিখে বাদী/দরখাস্তকারী তার বাসভবন থেকে কর্মস্থলে যাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে দ্বিতীয় পক্ষ ৪/৫ সন্ত্রাসী প্রকৃতির যুবক নিয়ে বাদীর গাড়ির গতিরোধ করে ও গাড়ির সামনের কাঁচে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। উক্ত হৈ হুল্লোড় দেখে সাক্ষীগণ আগাইয়া আসলে প্রতিপক্ষ চলে যেতে বাধ্য হয় ও বলে যায় যে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে জীবনে শেষ করিয়া ফেলিবে ও প্রয়োজনে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল খাটাবে।' এরূপ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

আদালত বাদীপক্ষের বক্তব্য শুনে প্রতিপক্ষ আসমাকে সশরীরে হাজির হয়ে কারণ দর্শানোর আদেশ প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে তাঁর বর্তমান ঠিকানায় আদালতের জারিকারকের মাধ্যমে নোটিশ পাঠানো হয়। জারিকারক প্রতিবেদন দাখিল করে জানান যে, তিনি প্রতিপক্ষের উল্লেখিত ঠিকানায় গিয়ে প্রতিপক্ষ আসমাকে মামলার বিষয় সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি উক্ত নোটিশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তিনি নোটিশ রীতিমতো জারি হয়েছে মর্মে

৫৪ হাজার টাকা অলংকার বাবদ পরিশোধিত ছিল। বিয়ের পর আফজাল হোসেন তাঁকে নিয়ে কানাডায় গিয়ে সেখানে স্থায়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সে সময় গত ২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে তিনি একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। সোনিয়া তখন তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর বাবার বাসায় গিয়ে ওঠেন। গত ৫ এপ্রিল ২০১০ তারিখে সোনিয়া ও আফজাল হোসেনের পুত্র সাদাইন চৌধুরী জন্মগ্রহণ করে। জন্মগতভাবেই বাচ্চাটা হার্টের রোগী। সোনিয়ার শ্বশুর দেওয়ান আশরাফ আলী তাঁর ছেলের রেখে যাওয়া জমিজমা ও ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা ভোগদখল করলেও সোনিয়ার বকেয়া দেনমোহর এবং সোনিয়া ও তাঁর সন্তান সাদাইনের ভরণপোষণ করছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে সোনিয়া গত ৩ মার্চ ২০১১ তারিখে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এ এসে এই সংক্রান্ত বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে বারবার আপোষ করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁর শ্বশুর কিছুতেই আপোষে রাজি হননি। বাধ্য হয়ে গত ৮ মার্চ ২০১২ তারিখে সোনিয়ার পক্ষে তাঁর শ্বশুরকে বিবাদী করে আদালতে দেনমোহর ও ভরণপোষণের মামলা করা হয়। বিষয়টি ব্যতিক্রমী ছিল, কারণ আসক এর আগে বাদীর স্বামী ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে এরূপ কোনো মামলায় প্রতিকার পায়নি। দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে এই মামলায় গত ১০ মে ২০১৫ তারিখে বাদীর পক্ষে রায় হয়। বিজ্ঞ আদালত মামলার বাদী সোনিয়ার বকেয়া দেনমোহর এবং বাদী ও তাঁর সন্তানের বকেয়া ভরণপোষণ বাবদ মোট ১৯ লাখ ২২ হাজার টাকা পরিশোধের জন্য বিবাদী, অর্থাৎ– বাদীর শ্বশুর দেওয়ান আশরাফ আলীকে আদেশ দেন। এ ছাড়াও আদালত বাদীর ভরণপোষণ বাবদ মাসিক ৮ হাজার টাকা ও বাদীর নাবালক পুত্র সাদাইন চৌধুরীর ভরণপোষণ বাবদ মাসিক ১০ হাজার টাকা করে পরিশোধের নির্দেশ দেন, যা বছরে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞ আদালত মামলার রায়ে উল্লেখ করেন যে, মামলার বাদীর স্বামী মারা যাওয়ায় তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে ও ক্রয়সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বাদী ও নাবালক পুত্রের ভরণপোষণ চালানো হবে। ■

আদালতকে অবহিত করেন। কিন্তু আসমার ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, তিনি মামলার বিষয়ে কিছুই জানেন না। কেউ কোনো নোটিশ নিয়ে তাঁর উক্ত ঠিকানায় যায়নি। মামলা সম্পর্কে জানতে পারলে তিনি অবশ্যই আদালতে স্বেচ্ছায় হাজির হতেন।

পরবর্তী নির্ধারিত তারিখে বাদীপক্ষ আসমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যুর আবেদন জানালে আদালত তা মঞ্জুর করেন। ফলে আদালত থেকে ২৩.০৯.২০১৫ তারিখে ৬৪২ নম্বর স্মারক মূলে আসমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা পাঠানো হলে উত্তরা পশ্চিম থানার পুলিশ এসআই আশিকুর রহমান ফোর্সসহ ৬.১০.২০১৫ তারিখ রাত আনুমানিক ১১.৪৫ মিনিটের সময় আসমার উল্লেখিত ঠিকানায় হাজির হন এবং তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় তাঁদের হেফাজতে রাখেন।

সেই রাতেই ১১টা ৫০ মিনিটে আসমা মোবাইল ফোনে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর কাছে আইনগত সহায়তা চান। পুলিশ ০৭.১০.২০১৫ তারিখে তাঁকে আদালতে হাজির করে। ওই দিন শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বন্ধ ছিল। তাই তাঁদের বিশেষ কোনো কোর্ট দায়িত্বে ছিল না। সংগত কারণেই চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে খণ্ড নথি তৈরি করানোপূর্বক ওই তারিখেই আসক-এর পক্ষ থেকে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৯৬ ধারা অনুযায়ী আসমার জামিনের দরখাস্ত দাখিল করা হয়। আদালত শুনানি শেষে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে নির্ধারিত আদালতে হাজির হওয়ার শর্তে আসমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধটি জামিনযোগ্য। এ অপরাধের ক্ষেত্রে আসামি জামিনে মুক্তি পাবেন, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এ ক্ষেত্রে এটি তাঁর অধিকার হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু জামিন-অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা বা নামঞ্জুর করা আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। আদালতের এই ক্ষমতা প্রয়োগকালে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করা হয়। প্রথমত, আদালত মামলার নথি পর্যালোচনা করে যদি দেখেন যে, আসামি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন মর্মে যুক্তিসংগত কারণ আছে, তাহলে জামিনের আবেদন নাকচ করা ছাড়া আদালতের অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না। দ্বিতীয়ত, আদালত যদি দেখেন যে, আসামি জামিন অযোগ্য অপরাধ সংঘটন করেছেন মর্মে বিশ্বাস করার মতো যুক্তিসংগত কারণ নাই, তাহলে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৭(২) ও (৪) উপধারার বিধানমতে জামিন মঞ্জুর করতে পারেন। সাধারণত যে আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়, সেই আইনেই কোন কোন অপরাধ জামিনযোগ্য ও কোন কোন অপরাধ জামিনযোগ্য নয়, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

পরবর্তী সময়ে নির্ধারিত আদালত তথা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪.১০.২০১৫ তারিখে আসমার জামিনের দরখাস্ত দাখিল ও শুনানি করা হলে আদালত স্থায়ী জামিন মঞ্জুর করেন। আসমা জামিনে মুক্তি পেলেও মামলাটি এখনো চলমান রয়েছে, যা তাঁকে সব সময় মানসিক পীড়া দেয়। ■

মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ থেকে ১৬!

আতাউল্লাহ্ নুরুল কবীর

গত ২১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশের বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২৯ জনের বিয়ে হয় ১৫ বছরের মধ্যে। আর ১৮ বছরের মধ্যে বিয়ে হয় শতকরা ৬৫ জনের। এর চেয়েও ভয়ংকর বিষয় হলো ১১ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় ২ শতাংশ মেয়ের। ইউনিসেফের ২০১১ সালে প্রকাশিত 'The State of the World's Children' রিপোর্টের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়সের আগেই ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ১৫ বছর বয়সের আগেই।

সরকার প্রচলিত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন The Child Marriage Restraint Act, 1929 বদলে নতুন আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৪' নামে যার একটি খসড়া তৈরি করেছে। গত ২৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত 'খসড়া আইনে মেয়েদের ১৮ বছরের কমে বিয়ের বিধান' শীর্ষক সংবাদে জানা যায়, খসড়াটি বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং (মতামত প্রদান) শেষে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ফেরত এসেছে। আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত পরবর্তী খসড়ায় বিয়ের ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলতে– ২১ বছর পূর্ণ করেনি, এমন ছেলে এবং ১৮ বছর পূর্ণ করেনি, এমন মেয়েকে বোঝানো হবে– উল্লেখ থাকলেও এর ১৬ ধারায় মেয়েদের বিয়ের বয়স কমানোর 'বিশেষ বিধান' রাখা হয়েছে। এই বিশেষ বিধানে বলা আছে : 'এই আইনের

অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিশেষ কারণ থাকিলে অথবা বিশেষ কারণের উদ্ভব হইলে, পিতা, মাতা বা অভিভাবকের সম্মতি অথবা আদালতের অনুমতিক্রমে ১৬ (ষোল) বৎসর পূর্ণ করিয়াছে এমন কোন নারীর সহিত ২১ (একুশ) বা তদর্ধ্ব বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন পুরুষের বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা বাল্যবিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে না।'

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় খসড়াটি মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর আগে গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইনটির বিষয়ে নির্দেশনা দেন যে, 'বিয়ের বয়স ১৮, তবে পিতামাতা বা আদালতের সম্মতিতে ১৬ বছর সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। সামাজিক সমস্যা কম হবে।' পরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের খসড়াটিতে এই বিশেষ বিধান সংযুক্ত করে যে, 'যুক্তিসংগত কারণে বাবা-মা বা আদালতের সম্মতিতে ১৬ বছর বয়সে কোন নারী বিয়ে করলে সেই ক্ষেত্রে তিনি অপরিণত বয়স্ক বলে গণ্য হবেন না।'

এরপর মানবাধিকারকর্মী ও আন্তর্জাতিক দাতাদের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে সরকার বারবার বলেছে, বিয়ের বয়স কমানো হবে না। কিন্তু গত ২৩ অক্টোবর *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহ প্রশ্নে পেছনে হাঁটছে বাংলাদেশ– এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদন' শিরোনামের রিপোর্ট থেকে জানা যায়– সরকার কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের বিয়ের বয়স কমানোর লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে গত ১৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ঢাকার *ডেইলি স্টার* কার্যালয়ে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' ও 'আমরাই পারি' নামের পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট আয়োজিত বাল্যবিবাহ বিষয়ক এক আলোচনাসভায় মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেন, 'আইনে কোনো শর্ত রাখব, না তা নীতিতে থাকবে, তা নিয়ে চিন্তা করছি।' সেখানে তিনি আরো বলেন, 'বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতির কথা প্রত্যাহার না করে আলোচনা করেন, সুপারিশ করেন। আমরা সব সুপারিশ মনোযোগ সহকারে দেখব।'[১]

আইন বা নীতি যেখানেই থাক, বিশেষ বিধান এবং বাবা-মা বা আদালতের সম্মতিসংক্রান্ত শর্তের কথা বলে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮-এর স্থলে ১৬ করলে এর অপব্যবহারই যে বেশি হবে, তা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। বাংলাদেশে যেখানে অহরহ মা-বাবাই বাল্যবিবাহের আয়োজন করে, সেখানে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া মানে অবিবেচনাপ্রসূতভাবে বাল্যবিবাহ আয়োজনকারীদের হাতে একটি মোক্ষম অস্ত্র তুলে দেয়া। অন্যদিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আদালত এবং আইন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মানসিকতাও ভাববার বিষয়। আদালতে অ্যাডভোকেট, পাবলিক প্রসিকিউটরসহ সবাই যে নারীর বিষয়ে সচেতন, তা নয়। সাধারণভাবে বিয়ের বয়স ১৮ রেখে আদালতকে ১৬ বছরে বিয়ের অনুমতি প্রদানের দায়িত্ব দেয়া মানে আদালতকেই আইনের ব্যত্যয় ঘটাতে অনুপ্রাণিত করা। আবার, আদালতে বিয়ের অনুমতি নিতে হলে নিশ্চয়ই একটি মামলা করতে হবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো সেই মামলার বাদী কে হবেন? ১৮ বছর বয়স না হলে, অর্থাৎ– সাবালক না হলে কেউ সরাসরি মামলা করতে পারে না, আইনগত অভিভাবকের মাধ্যমে মামলা দায়ের করতে হয়। তার মানে হলো, ঘুরেফিরে ক্ষমতাটি বাল্যবিবাহ আয়োজনকারীদের হাতেই থেকে যাচ্ছে। আরেকটি গুরুতর সমস্যা হলো, এই মামলার বিবাদী কাকে করা হবে– সেই বিষয়টিও স্পষ্ট নয়।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, বাংলাদেশের শিশু নীতি এবং শিশু আইনসহ অনেক আইনে ১৮ বছরের কম বয়স্ক প্রত্যেককে শিশু বলা হয়েছে। সাবালকত্ব অর্জনের জন্য ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর করার প্রধান কারণ হলো তার আগে কোনো ব্যক্তির সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ সক্ষমতা ও পরিপক্বতা আসে না। সাবালক না হলে কোনো ব্যক্তি চুক্তি করতে পারে না কারণ চুক্তিতে তার সম্মতির কোনো মূল্য নেই। বিয়ে একধরনের দেওয়ানি চুক্তি এবং এতে স্বাধীন সম্মতি একটি অপরিহার্য উপাদান। এ ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের সাবালকত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ একজন নাবালকের সম্মতিকে আইনে কখনোই স্বাধীন সম্মতি হিসেবে গণ্য করা হয় না।

বাবা-মায়ের কিংবা আদালতের সিদ্ধান্তে মেয়েদের ১৬ বছরে বিয়ের আইন করলে এই ইঙ্গিতই দেয়া হয় যে, মেয়েদের নিজের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার অধিকারকে সরকার সমর্থন করে না। বিয়ের মতো জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত একজনের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার প্রথা যেখানে বিলোপ করা জরুরি, সেখানে এ ধরনের পশ্চাৎপদ আইন করে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে আয়োজনের মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে উৎসাহিত করার কোনো মানে হয় না। এ প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখিত *ডেইলি স্টার* কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের বাল্যবিবাহ বিষয়ক আলোচনাসভার সভাপতি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত সভায় তিনি বলেন, 'আমরা সরকারের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করছি, আইনগত সুরক্ষা দিয়ে 'বিপদগ্রস্ত' হওয়া থেকে যাতে আমাদের রক্ষা করে।'

একটি আইন শতভাগ জনগণকে মানতে কখনোই বাধ্য করা যায় না, কিন্তু আইন সমাজে একটি মানদণ্ড তৈরি করে দেয়। প্রায় ১০০ বছর ধরে এ দেশে মেয়েদের বিয়ের আইনানুগ বয়স ১৮ বছর। এখন এটি একটি মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো, মেয়েদের প্রজননস্বাস্থ্যের উন্নতি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীশিক্ষাকে উৎসাহ প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও নারীর সম-অধিকার ইত্যাদি অনেক সামাজিক সূচকের প্রতি লক্ষ রেখে আইনে বিয়ের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছিল। একে সামনে রেখে সরকারি-বেসরকারি অগণিত উন্নয়নকর্মী, অধিকারকর্মী ও নারী আন্দোলনকর্মীর শতবছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে যখন দেশের সামাজিক সূচকগুলোতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হচ্ছে, তখন মেয়েদের বিয়ের বয়সের প্রতিষ্ঠিত যৌক্তিক মানদণ্ড থেকে পিছু হটার হঠকারী সিদ্ধান্ত সমাজে অবশ্যই একটি অশুভ ইঙ্গিত দেবে। ■

তথ্যসূত্র

প্রথম আলো, ১৯.১০.২০১৫

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা
তথ্য অধিকারের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে

শরীফুল ইসলাম সেলিম

আমাদের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে তথ্য অধিকার আইন আছে। আমাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে জনগণের জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত জনগণ এই আইন সম্পর্কে ভালোভাবে জানার সুযোগ পায়নি। পাশাপাশি যাঁরা তথ্য প্রদান করবেন সেই কর্তৃপক্ষের সচেতনতা ও প্রস্তুতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ।

সুদীর্ঘকাল ধরে দাপ্তরিক তথ্য গোপনের যে চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে, তা থেকে সরকারি কর্মকর্তাগণ বেরিয়ে আসতে পারছেন না। তাই এখন পর্যন্ত তাঁরা তথ্য প্রদান বা প্রকাশ করতে আগ্রহী নন। আবার কোন তথ্য প্রদান করবেন, কোন তথ্য প্রদান করতে তিনি বাধ্য নন, কী পন্থায় তথ্য প্রদান করবেন– এসব বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই তাঁরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। এ ছাড়া 'তথ্য দিয়ে আবার কোন বিপদে পড়ি'– এমন ভীতিও কাজ করছে মাঠ পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তার মধ্যে। এসকল বিষয় মাথায় রেখে তথ্য অধিকার আইন পাসের প্রায় সাড়ে ছয় বছর পর প্রতিটি সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি অফিসের নিজস্ব তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক সরকারি অফিস তাদের স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করেছে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা কী

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা হলো তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে প্রণীত কোনো কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা, যা অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষ আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে জনগণের কাছে তথ্য উন্মুক্ত করতে পারে। এই নীতিমালায় তথ্য প্রদান, প্রকাশ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ অন্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধান সন্নিবেশিত থাকবে, যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা কেন প্রয়োজন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে, কেউ তথ্যের জন্য আবেদন করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষা করেন। ভীতি, দিকনির্দেশনার অভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, দাপ্তরিক প্রজন্ম পরম্পরা-বাহিত মানসিকতা, চিরাচরিত দাপ্তরিক চর্চা ইত্যাদি কারণে এমনটা ঘটছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথ নির্দেশনা পেতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন।

এ ছাড়া দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের বিধান অনুসরণে তথ্য গোপন করার যে চর্চা তিনি করেছেন, তা থেকে সহজে তিনি বেরিয়ে আসতে পারছেন না। এই গোপনীয়তার সংস্কৃতি ও তথ্য প্রদানজনিত সমস্যা ও শাস্তির ভীতি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করতে তিনি এই পথ বেছে নিচ্ছেন। কারণ তাঁর হাতে তথ্য অধিকার আইন আছে, কিন্তু এমন কোনো নির্দেশনা বা অনুমোদিত পদ্ধতি নেই, যা তাঁকে আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। এই ক্ষেত্রে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ইউনিটের নিজস্ব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত হওয়ার কারণে এটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিশ্চিন্ত করবে এবং এটির অনুসরণ তাঁর জন্য অনেক স্বস্তিদায়ক হবে। তথ্য প্রদানের জন্য যেমন তাঁকে কারো অনুমতি বা অনুমোদন নিতে হবে না, তেমনি কোনো জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে না। ফলে তাঁর তথ্য প্রদানের ভীতি ও অনীহা দূর হবে।

শুধু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নন, নীতিমালায় আপিল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়েও দিকনির্দেশনা থাকবে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের করণীয় নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করে।

তথ্য অধিকার আইনে কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্টতা

সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ গেজেটে প্রকাশ করেছে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আইনের প্রস্তাবনায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, 'কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।' (ধারা-৪)

প্রতিটি সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি অফিসের নিজস্ব তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালায় মূলত যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা নিচে তুলে ধরা হলো–

তথ্যের ধরন এবং ধরন অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি

নাগরিকের তথ্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হলে কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যকে নির্দিষ্ট ধরন অনুসারে ভাগ করে প্রকাশ ও প্রদানের পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করতে হবে। বিগত বছরগুলোতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে কর্তৃপক্ষ তার সমুদয় তথ্যকে ধরন অনুসারে ৩ ভাগে ভাগ করবে :

ক. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য
খ. চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য
গ. প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য;

তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

নির্দেশিকা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কী হবে অথবা কোন আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা বা নির্দেশনা অনুসারে হবে তা নীতিমালায় উল্লেখ করবে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫-এ তথ্য সংরক্ষণ-বিষয়ক নির্দেশনা দেয়া আছে, যা সকলের জন্য অনুসরণ আবশ্যক। এ ছাড়া তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০-এ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। কর্তৃপক্ষের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কোন আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা বা নির্দেশনা অনুসারে হবে তা নীতিমালায় উল্লেখ করতে হবে। তথ্য অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তথ্যের নিয়মিত হালনাগাদকরণ। তথ্য নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হালনাগাদকরণের ব্যাপারে নীতিমালায় নির্দেশনা থাকবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০-এ কর্তৃপক্ষের সকল ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত ধারা ১০-এর আলোকে নীতিমালা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ কীভাবে তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন নীতিমালায় তার উল্লেখ থাকবে। পাশাপাশি প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিট-প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন মর্মে এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এ 'বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' বলে কোনো পদের উল্লেখ না থাকলেও 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য তথ্য কমিশন একজন 'বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশনা জারি করেছে। নীতিমালা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পদ্ধতি নীতিমালায় উল্লেখ করবে।

তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা

কোনো নাগরিক তথ্য চেয়ে আবেদন করতে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করবে, তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা-৮ ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর বিধি ৩-এ বর্ণনা করা হয়েছে এবং আবেদন পেলে তথ্য প্রদান বা অপারগতা প্রকাশে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা-৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর বিধি ৪ ও ৫ এ বর্ণনা করা হয়েছে। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা অনুসারে উল্লেখ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিভিন্ন ধাপে কাজের সময় বেঁধে দেয়া আছে। কর্তৃপক্ষ চাইলে আইন ও বিধিমালায় উল্লেখিত সময়ের চেয়ে নীতিমালায় কম সময় নির্ধারণ করতে পারে, তবে উল্লেখিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় নির্ধারণ করা যাবে না।

আপিল কর্তৃপক্ষ

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে আপিল কর্তৃপক্ষ হলেন সেই ব্যক্তি, তথ্য না পেলে আবেদনকারী নাগরিক যার কাছে প্রথম প্রতিকার চাইবেন। অর্থাৎ– কোনো নাগরিক যদি তথ্যের জন্য আবেদন করে

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৯-এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হন কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি এই আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবেন।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা-২(ক)(অ) অনুসারে, যে কার্যালয়ে তথ্যের জন্য আবেদন করা হবে, তার ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান প্রথম কার্যালয়টির আপিল কর্তৃপক্ষ হবেন। অর্থাৎ– কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হবেন ওই ইউনিটের আপিল কর্তৃপক্ষ।

আপিল পদ্ধতি

কোনো নাগরিক তথ্যের জন্য আবেদন করে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৯-এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে, সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার বা সংক্ষুব্ধতার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবেন। অতিরিক্ত মূল্য ধার্য বা গ্রহণ করলেও আবেদনকারী আপিল করতে পারবেন।

তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২৭-এ তথ্য প্রদানে অবহেলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান সংযোজিত হয়েছে। তথ্য কমিশনে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলে তথ্য কমিশন নির্ধারিত পন্থা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

আদালতে মামলার দীর্ঘসূত্রতা সমাধানকল্পে এডিআর

জোহরা খাতুন

মানুষে মানুষে আদান-প্রদান, সম্পর্ক এবং লেনদেনের ফলেই সৃষ্টি হয় বিরোধের এবং এই বিরোধ মীমাংসার জন্যই মানুষ আদালতের দ্বারস্থ হয় ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায়। আর এই ন্যায়বিচার অনেকটাই নির্ভর করে মামলাটি যথাসময়ে নিষ্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের আদালতে মামলার দীর্ঘসূত্রতা, বিশেষ করে দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে যেন একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মামলার জট নিরসনকল্পে পত্রপত্রিকায় যে নিয়মিত রিপোর্ট ও নিবন্ধন বের হচ্ছে, তা সত্যই ভয়ংকর। বর্তমানে বাংলাদেশের নিম্ন আদালতেই ৩০ লাখের বেশি মামলা বিচারাধীন। আর এ মামলা-জটের অন্যতম কারণ হচ্ছে বিচারকসংকট এবং সেই তুলনায় প্রতিবছর নতুন মামলার সংখ্যাধিক্য।

গত ৫ নভেম্বর *প্রথম আলোর* এক নিবন্ধ অনুযায়ী ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় ৩ লাখ এবং অধস্তন আদালতে প্রায় পৌনে ৬৫ লাখ নতুন মামলা দায়ের হয়েছে। এই সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ২ লাখ ৬৬ হাজার এবং অধস্তন আদালত ৫২ লাখ ৬৪ হাজার মামলা নিষ্পত্তি করেছে। এতে দেখা যায়, মামলা দায়েরের চেয়ে নিষ্পত্তির হার বেশ কম। অর্থাৎ– প্রতিবছর ২ লাখ ৬০ হাজার মামলার ব্যাকলগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং এ অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে ২০১৯ সালে মামলা-জট গিয়ে পৌঁছাবে ৪৪ লাখে।

আগেই বলেছি, মামলা-জটের অন্যতম কারণ বিচারকসংকটের সঙ্গে আদালতে অবকাঠামোর বেহাল দশা। বর্তমানে বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগ মিলে ১০২ জন এবং নিম্ন আদালতে বিচারক পদে কর্মরত আছেন ১ হাজার ২২৭ জন। অর্থাৎ– বাংলাদেশে এখন সক্রিয় বিচারক ১ হাজার ৩২৪ জন। সার্বিক বিচারে বিচারকদের মাথাপিছু ব্যাকলগ ২ হাজার ৩৩২। তা ছাড়া অনেক আদালতেই বিচারকরা এজলাস ও

খাসকামরা পালাক্রমে ব্যবহার করছেন, যা মামলা যথাসময়ে নিষ্পত্তির অন্যতম প্রতিবন্ধক। এর উদাহরণসরূপ বলা যায়– সম্প্রতি ৫ নভেম্বর *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে ৫৪ জেলায় ৩৪২ জন বিচারক ১৬৪টি এজলাস ও খাসকামরা পালাক্রমে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ ছাড়া ৬৪ জেলায় মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালত ভবন নির্মাণকাজ শুরুর গত পাঁচ বছরে মাত্র ছয় জেলায় ভবন নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। বাকি ৫৮টির অর্ধেক ধীর গতিতে চলছে এবং বাকি জেলাগুলোতে জমি অধিগ্রহণ কাজ শেষ হয়নি।

মামলা নিষ্পত্তির ধীরগতির অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে নানা মত-অভিমত ও সুপারিশ রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে জোরালো মত হচ্ছে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর)-এর উপর জোর দেয়া। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সচরাচর দেওয়ানি বিরোধ মীমাংসার তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরী। যেমন : (ক) স্বাভাবিক বিচারব্যবস্থার জটিলতা থেকে বিকল্প বিরোধ মানুষকে মুক্তি দেয়। স্বাভাবিক দেওয়ানি বিচারব্যবস্থায় অনেক আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়, যেমন– সাক্ষ্য আইনের সকল নিয়ম মেনে চলতে হয়। ফলে বিচারপ্রার্থীর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা

তথ্যাদি পরিদর্শন এবং প্রকাশিত প্রতিবেদন বিক্রয়ের সুযোগ

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৬(৫)-এ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনা মূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করার ও বিক্রয়ের বিধান রয়েছে, যা নীতিমালাতেও যুক্ত থাকবে।

সুতরাং সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সাংবিধানিকভাবে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বেসরকারি সংস্থার কাছে এই আইন অনুসারে যেকোনো নাগরিক তথ্য চাইতে পারবে এবং এসকল সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য চাওয়া হলে তথ্য প্রদানের জন্য বাধ্য থাকবে। তাই তথ্য অধিকার আইনকে কার্যকর করার জন্য এই নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন আবশ্যক। নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যের ধরন, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা, তথ্য প্রদানের সময়সীমা ও আপিল কর্মকর্তার নাম উন্মুক্ত স্থানে বা নোটিশ বোর্ডে টাঙানো আবশ্যক এবং একই সঙ্গে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সেই সঙ্গে অনলাইনে বা ইন্টারনেটে সহজ উপায়ে ঘরে বসে স্বল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে তথ্য পাওয়া যায় এবং তথ্য না দিলে আপিল কর্মকর্তার নিকট আপিল যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাহলেই আইনটি কার্যকর করার মাধ্যমে জনগণের তথ্য চাওয়ার পথ সুগম করবে তেমনি সকল কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদানে বাধ্য করে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। তাহলেই আমরা এই আইনকে কাজে লাগিয়ে সমাজে মানুষের অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে এবং সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমে জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারব। ■

(তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা সহায়িকা অবলম্বনে সংকলিত)

করতে হয়। সেই তুলনায় বিকল্প বিরোধ পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিকতা অতি অল্প সময় এবং সহজে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব। (খ) বিকল্প পদ্ধতিতে মানুষের সময় এবং অর্থের অপচয় রোধ করে। জটিলতা, আনুষ্ঠানিকতা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে আদালত-ব্যবস্থায় প্রায়ই বিচার প্রার্থীর অর্থের অপচয় হয়। (গ) বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি মানুষকে সহমর্মী ও সমঝোতাপূর্ণ হতে শিক্ষা দেয়। মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ ২০০৩ সালে দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধন করে এবং অর্থ ঋণ আদালত আইনে এডিআর পদ্ধতি চালু করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত আইনে এডিআর বিধান রয়েছে– ১. দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৮৯(ক), ৮৯(খ), ৮৯(গ)। ২. অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩। ৩. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ধারা ৬, ৭, ৯ এ। ৪. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮১-এর ধারা ১০, ১৩, ২৩ এ। ৫. সালিশ আইন, ২০০১। ৬. গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬। ৭. বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪। যদিও আইন পেশার সঙ্গে জড়িত মোটামুটি সবাই একমত যে, মামলা-জট নিরসন করতে হলে এডিআর-এর কোনো বিকল্প নেই কিন্তু বাংলাদেশের আদালতে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আইনজীবীরা এডিআর-ব্যবস্থা চালু করতে উৎসাহী হচ্ছেন না। কারণ তাতে তাঁদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া বিচারক এবং আইনজীবীদের এডিআর-ব্যবস্থার ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অপ্রতুল। আমেরিকাতে এডিআর-এর জন্য Civil Justice Reform Act, 1990 এবং Alternative Dispute Resolution Act, 1998 রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এডিআর-এর জন্য বিশেষ নির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। যার কারণে অনেক সময় এডিআর-ব্যবস্থাও সাধারণ মামলার মতোই দীর্ঘসূত্রতায় আবদ্ধ। যেমন– সালিশ আইন, ২০০১-এ সালিশ ট্রাইব্যুনালে প্রথম দুজন সালিশকারী রোয়েদাদ দেন এবং উক্ত রোয়েদাদ ভিন্ন হলে তখন এটি চেয়ারম্যানের কাছে যায় এবং চেয়ারম্যান পুনরায় শুনানি করে রোয়েদাদ দেন।

এ ক্ষেত্রে সদস্য (চেয়ারম্যানসহ) যদি একত্রে বিরোধটি শোনেন, তাহলে অতি দ্রুত রোয়েদাদ দিতে পারেন। তা ছাড়া এই রোয়েদাদ আবার জেলা জজ আদালতে চ্যালেঞ্জযোগ্য। অর্থাৎ– যে পক্ষ হেরে যাবে, তারা যদি হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা এবং আপিল বিভাগে রিভিশন করার সুযোগ পায়, অন্য সকল দেওয়ানি মামলার মতো দীর্ঘসূত্রতা বেড়ে যাবে, যা এডিআরের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। পাশাপাশি বাংলাদেশে চলমান আইনে এডিআর-ব্যবস্থায় এডিআর-এর ফলাফলের ওপর আদালতের তদারকি ক্ষমতা নেই বললেই চলে। কিন্তু আমেরিকা ও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আদালতে তদারকি ক্ষমতা রয়েছে সরাসরি এডিআর-এর ওপর। তা ছাড়া গ্রাম আদালত, ২০০৬ আইনের অধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় গ্রামের প্রভাবশালীদের পক্ষেই অনেক সময় কাজ করার অভিযোগ রয়েছে।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে যে মামলা-জট কমানোসহ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়, তার নজির প্রতিবেশী ভারতসহ আমেরিকার বিচারব্যবস্থাই যথেষ্ট। বাংলাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি থাকার কারণে যথাযথ লক্ষ্য অর্জন নানা কারণে এখনো বাধাগ্রস্ত। এ ক্ষেত্রে আইনের এডিআর-সংক্রান্ত বিধানের যথাযথ সংস্কার এবং নতুন আইন প্রণয়ন, দক্ষ বিচারক, এবং বার ও বেঞ্চের মধ্যে মেলবন্ধনের মাধ্যমে এডিআর-ব্যবস্থা পুরোপুরি লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়ে মামলা-জট নিরসন এবং সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারবে বলে আমরা আশা করি। ■

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন একটি পর্যালোচনা

মো. নাহিদ হোসেন

বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের বড় কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি। এর ফলে আবহাওয়া পরিবর্তনের পাশাপাশি বেড়ে চলছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং বিশ্ব নিয়মিত সম্মুখীন হচ্ছে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের। ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়াগত কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ জনপদ। বিগত কয়েক দশকের জলবায়ু পরিবর্তন দুর্যোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৯০-২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ২ হাজার ১৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ১.৮ শতাংশ। ১৯৬৮ সালে অরেলিও পিচ্ছি এবং আলেকজান্ডার কিং কর্তৃক Club of Rome (পরিবেশ-বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বা পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে ধারণা পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় ১৯৭২ সালের পর থেকে। ১৯৬৮ সালে সুইডেন জাতিসংঘকে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে প্রথম সুইডেনের স্টকহোমে ৫-১৬ জুন United Nations Conference on Human Environment (UNCHE) বা মানব পরিবেশবিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর এতে বাংলাদেশ সহ ১১৪টি দেশ অংশ নেয়। এই সম্মেলনকে স্টকহোম কনফারেন্সও বলা হয়ে থাকে। এরপর পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে যুগোপযোগী পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩ এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ অন্যতম। তবে বাংলাদেশে পরিবেশের সামগ্রিক ধারণাটি প্রথম জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত হয় ১৯৯২ সালে পরিবেশ ও উন্নয়ন-সম্পর্কিত সম্মেলনের পরে জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা, ১৯৯২-এর মাধ্যমে। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে ৩-১৪ জুন পরিবেশ বিষয়ে সবচেয়ে বড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত হয় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫। বাংলাদেশে পরিবেশের সামগ্রিক দিক তুলে ধরার প্রথম যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও রোধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই আইনটি পথচলা শুরু করে। ২১টি ধারা নিয়ে সংসদে পাস হওয়া পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

(১) এই আইনের সংজ্ঞা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ধারা ২০-এ আইনটি আরো পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধিমালা তৈরির বিধান অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ প্রণীত হয় যা আইনটিকে আরো সফল ও কার্যকরী করবে।

(২) ধারা ৩ অনুসারে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তরকে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

(৩) এই আইনে পরিবেশগত ছাড়পত্র নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ধারা ১২ অনুসারে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ ছাড়পত্র পাবার সকল নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। পরিবেশের ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব যাচাইপূর্বক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।

(৪) উক্ত আইনের ৬ ধারায় বলা আছে যে, স্বাস্থ্যহানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ করে, এমন কোনো যানবাহন চালানো যাবে না। এ ছাড়া ধারা ৬গ অনুসারে সরকার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রি, মজুত, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারবেন।

(৫) পরিবেশ আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে এই আইনে। উক্ত আইনের শাস্তির বিধান সর্বনিম্ন ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডপূর্বক অনধিক ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত শাস্তির বিধান আছে।

(৬) এই আইন অনুসারে পরিবেশগতভাবে জীববৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মুমূর্ষু এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে Ecologically Critical Area (ECA) হিসেবে। যে সমস্ত এলাকা দূষণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকে এবং উক্ত এলাকায় বেশি নজর দেয়া জরুরি, সেসব এলাকাকে ECA হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট অনুসারে সরকার এ পর্যন্ত আটটি এলাকাকে ECA ঘোষণা করেছে। এগুলো হলো– কক্সবাজার, টেকনাফ

সমুদ্রসৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, মারজাত বাঁওড় (ঝিনাইদহ) ও সুন্দরবন।

(৭) ২০০২ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কিছু সংশোধনী আনা হয়। সর্বশেষ ২০১০ সালের সংশোধনীতে কিছু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংশোধিত এই আইনে জলাধার ভরাট, পাহাড় কাটা, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য, জাহাজ ভাঙা বা কাটার ফলে সৃষ্ট দূষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো পালনের লক্ষ্যে আইনটি প্রণীত হলেও কিছু দুর্বলতা বা অসংগতি আইনটির সফলতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন–

(১) উক্ত আইনে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে লাগামহীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা তার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করে। এ ছাড়া মহাপরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নির্দিষ্ট বিধান, যেমন– তাঁর নিয়োগ প্রক্রিয়া, মেয়াদ, সুযোগ-সুবিধা, অপসারণ কিংবা যোগ্যতার ব্যাপারে কিছুই বলা নেই। এ ক্ষেত্রে তিনি পরিবেশ বিষয়ে কম জ্ঞানসম্পন্নও হতে পারেন। অথচ আইনে বিভিন্ন ধারায় তাঁর নিজস্ব বিবেচনাবোধ ব্যবহার করে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা আছে। সুতরাং পরিবেশ দূষণ বিষয়ে তাঁর পরিষ্কার জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা না থাকলে এই আইনের উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর মহাপরিচালকের যথাযথ জবাবদিহির কোনো ব্যবস্থাও রাখা হয়নি।

(২) ২০১০ সালের সংশোধনী ৬ঙ ধারায় বলা হয়েছে, 'আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, জলাধার (Wetlands) হিসেবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা কোনোরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। তবে অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বিধিনিষেধ শিথিল করা যেতে পারে।' এখানে 'অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ' শব্দটির কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি, অর্থাৎ– কোন ভিত্তিতে এটি নির্ধারিত হবে তা পরিষ্কার নয়। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলে তা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করবে এবং কোনো মহল তার সুবিধা নিতে পারে।

(৩) এই আইনের অনেক ধারা বা উপধারা একটু জটিল, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অনেক সময় কষ্টকর। এ ছাড়া এই আইনে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জনসম্পৃক্ততা বা জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হয়নি। জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ বা সচেতনতার ব্যবস্থা করা না হলে পরিবেশ সংরক্ষণ করা অনেকাংশে অসম্ভব। সরকারের সঙ্গে জনগণের সমন্বিত উদ্যোগই পারে একটি সুন্দর, নির্মল বাসযোগ্য বাংলাদেশ উপহার দিতে। এজন্য মানুষকে বেশি করে গাছ লাগাতে এবং বনভূমি উজার না-করতে উৎসাহিত করার বিকল্প নেই। এ ছাড়া পরিবেশবিষয়ক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা জরুরি।

(৪) উক্ত আইনের ধারা ৫-এ বিভিন্ন এলাকাকে Ecologically Critical Area (ECA) হিসেবে চিহ্নিত করার বিধান রাখা হয়েছে। অথচ এরূপ ঘোষণার ক্ষেত্রে কোনো মান (Standards) নির্দিষ্ট করা হয়নি। এটি ঘোষণা করার কোনো সময়সীমাও উল্লেখ নাই। কিন্তু Rio Declaration-এর নীতিমালা ১৫-তে রাষ্ট্র যত দ্রুত সম্ভব পরিবেশ সংরক্ষণের পূর্বসতর্কতামূলক (Precautionary Measures) এরূপ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে কোনো সময়সীমা না থাকায় কাজে শিথিলতা আসার আশঙ্কা থেকে যায়। এ ছাড়া এই ঘোষণা করার জন্য সরকারের সন্তুষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার ব্যবহারের আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

(৫) এই আইনে আন্তর্জাতিক কোনো চুক্তি বা সনদ বাস্তবায়নের কোনো প্রতিশ্রুতি (Commitment) দেয়া হয়নি। ভারতে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬-এর প্রস্তাবনায় স্টকহোম কনফারেন্স এ গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভারতে ধারা ১২ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এক বা একাধিক পরিবেশ-বিষয়ক গবেষণাগার (Environmental Laboratories) তৈরির বিধান রাখা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিবেশের নিয়ামকসমূহের নমুনা সংগ্রহ করে তার রিপোর্ট প্রদান করা। কিন্তু বাংলাদেশের আইনে এরূপ কোনো ব্যবস্থা নেই।

(৬) এ ছাড়া আইনটিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ আদালতগুলোয় জনসাধারণের অভিগম্যতা খুবই কম, যা আরেকটি শঙ্কার কারণ। সাধারণ মানুষের অসচেতনতা কিংবা এই বিষয়ে তাদের যথাযথ তথ্য প্রদানের ঘাটতিও একটি বড় কারণ হিসেবে ধরা যায়। এ বিষয়ে আসক *বুলেটিন* সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ ধরনের কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে আইনটিকে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেশ বিনষ্টকারী কার্যক্রম, যেমন– জোরপূর্বক নদী ভরাট, বনের গাছ কেটে ফেলা, পাহাড় কাটা প্রকাশিত হলেও এর বিরুদ্ধে কোনো দৃশ্যমান ব্যবস্থা আমরা দেখিনি। প্রশাসনের ব্যর্থতা এবং সরকারের উদাসীনতা এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এ ছাড়া প্রভাব খাটিয়ে অপরাধীদের খুব সহজে ছাড় পেয়ে যাবার সংস্কৃতি আইনটিকে আরো অকার্যকর করে দেয়। এ ধরনের অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পাবার সংস্কৃতি বন্ধ করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে আইনের শাসন বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে পরিবেশ সংরক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে, রাষ্ট্র, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

অতএব, সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদে যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা পালনে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ এবং প্রচলিত আইনের দুর্বলতা বা ফাঁকফোকর চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবশ্যই উপেক্ষিত হবে না– এটিই সকলের প্রত্যাশা।■

আইনের সালতামামি

সমীর কর্মকার

২০১৫ সালে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত ধর্ষণ, ফতোয়ার মতো বিষয়গুলিতে যুগান্তকারী কিছু সিদ্ধান্ত প্রদান করছেন। তেমনিভাবে শ্রমবিধিমালা ২০১৫, ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইনের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আইন প্রণীত হয়েছে। নিম্নে উচ্চ আদালতের এই সকল আদেশ, রায় এবং ২০১৫ সালে প্রণীত জনগুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ফতোয়া উচ্চ আদালতের রায়

গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ প্রকাশিত হয় ফতোয়াসংক্রান্ত আপিল বিভাগের রায়ের (দেওয়ানি আপিল ৫৯৩-৫৯৪, ২০০১) পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেন:

১. ধর্মীয় বিষয়ে যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তিরা শুধু ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে ফতোয়া দিতে পারবেন। এই ফতোয়া স্বেচ্ছায় গৃহীত হতে হবে। ফতোয়া মানতে কাউকে বাধ্য করা, জোর করা কিংবা অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ করা যাবে না।

২. কোনো ব্যক্তির দেশে প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত অধিকার, সম্মান বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন বা প্রভাবিত করে, এমন ফতোয়া কেউ প্রদান করতে পারবে না।

৩. ফতোয়ার নামে কোনো প্রকার শাস্তি শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না।

৪. তবে ওই নির্দিষ্ট ফতোয়াটি (যা হাইকোর্ট অবৈধ বলেছেন) অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হলো।

উচ্চ আদালতের এই রায়ের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, এটি ফতোয়ার অপব্যবহারকে নিষিদ্ধ করেছে, ফতোয়াকে সরাসরি নিষিদ্ধ করেনি।

সৌজন্যে: আলমগীর হোসেন, বাংলা ট্রিবিউন

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ আদালতের রায়

ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনো শাস্তির বিধান না থাকা, বিচার বিভাগের বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা এবং সংবিধানের আইনগত অধিকারের পরিপন্থি হবার কারণে গত ৫ মে ২০১৫ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ, ১৯৯৫-এর নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনটির ধারা ৬(২), ৬(৩), ৬(৪) অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি আদালত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ৩৪(২) ধারাকেও অবৈধ বলে ঘোষণা করেন, যেহেতু এই ধারাবলে '৯৫-এর রহিত করা আইনটি ২০০০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারির আগে দায়ের করা মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। ২০০৫ সালে হাইকোর্টে দায়ের করা এক রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে (রিট পিটিশন নং ৮২৮৩/২০০৫) প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের চার সদস্যের একটি বেঞ্চে এই রায় প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে গত ৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ অত্র মামলার আসামি শিশু অপরাধী শুকুর আলীর মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ– এই রায়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন (দমন) আইনের অসাংবিধানিক ও কর্তৃত্বপূর্ণ ধারাগুলিকে বাতিল করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশে শিশু অপরাধীর সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ডকে বাতিল করা হয়েছে।

ধর্ষণ ও হাইকোর্টের রুল

রাজধানীতে এক গারো তরুণীকে গণধর্ষণের ঘটনায় নারীপক্ষ, মহিলা পরিষদ, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং ব্লাস্ট গত ২৪ মে একটি রিট আবেদন (রিট পিটিশন নং ৫৫৪১/২০১৫) করলে প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের বেঞ্চ ২৫ মে তিনটি রুল জারি করেন। প্রথম রুলে, মামলা গ্রহণে অবহেলা, ভিকটিমকে সাপোর্ট সেন্টারে পাঠানো এবং ডাক্তারি পরীক্ষায় বিলম্ব কেন অসাংবিধানিক এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের লঙ্ঘন হবে না– তা জানতে চাওয়া হয়েছে; দ্বিতীয় রুলে, ধর্ষণের শিকার

তরুণীকে কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না– তা জানতে চান আদালত; এবং তৃতীয় রুলে আদালত জানতে চেয়েছেন, মামলা নিতে বিলম্বের জন্য দায়ী পুলিশের বিরুদ্ধে কেন শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ব্যবস্থা নেয়া হবে না। একই সঙ্গে আদালত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপরোক্ত রুলের জবাব দেওয়ার জন্য ও মামলা গ্রহণে অবহেলার জন্য দায়ী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানতে চেয়ে স্বরাষ্ট্রসচিব, আইজিপি ও ঢাকার পুলিশ কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট থানার ওসি ও থানার ডিউটি অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি থানায় ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ ও জন্মপরিচয়-নির্বিশেষে বৈষম্যহীনভাবে সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্রসচিব, আইজিপি ও ঢাকার পুলিশ কমিশনারকে একটি সার্কুলার জারির নির্দেশ দেন। এই আদেশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব অবহেলায় অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদান করে এবং আদালত-নির্দেশিত সার্কুলারও জারি করে। যৌন হয়রানি ও সহিংসতা বন্ধে বিদ্যমান আইন ও আইনি প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, আইনজীবী ও নারী অধিকার কর্মীদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করতে রিটকারীদের কাছে নামের তালিকা চেয়েছিলেন হাইকোর্ট ডিভিশন, যা ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে।

২০১৫ সালে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এই সকল আদেশ ও রায়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সামাজিকভাবে এই সকল অপরাধ প্রতিরোধের দিকনির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

শ্রম বিধিমালা, ২০১৫

২০১৩ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন, (২০০৬) সংশোধন করার প্রায় দুই বছর পর বাংলাদেশ সরকার গত ১৫ সেপ্টেম্বর শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ পাস করল। আলোচ্য বিধিটিতে মোট বিধির সংখ্যা ৩৬৭টি এবং এর তফসিল সংখ্যা সাতটি। এই বিধিমালা অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে শ্রম মহাপরিদর্শক অনুমোদিত একটি নিজস্ব চাকরি বিধি প্রবর্তন করতে হবে। এ ছাড়া যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকরিবিধি রয়েছে, তাদেরও এই বিধিমালা জারির তিন মাসের মধ্যে শ্রম মহাপরিদর্শকের মাধ্যমে সেটির অনুমোদন করাতে হবে। পাশাপাশি কর্মী সরবরাহকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানও যাতে শ্রম আইন লঙ্ঘন করতে না পারে, এটা নিশ্চিত করতে এই সকল প্রতিষ্ঠানকেও শ্রম মহাপরিদর্শকের নিকট হতে অনুমোদন ও লাইসেন্স গ্রহণকে আবশ্যক করা হয়েছে। ১৮ নম্বর বিধি অনুসারে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই শ্রমিকের শ্রেণি, সংখ্যা ও প্রকৃতি উল্লেখ করে একটি সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) প্রণয়ন করবে। নিয়োগ ও পরিচয়পত্রকে এই বিধি অনুসারে শ্রমিকের অবশ্যপ্রাপ্য চাকরি-দলিল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই দুটি বিষয় ছাড়া কোনোভাবেই একজন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। তথ্য সংগ্রহ ও অন্তর্ভুক্তির স্বার্থে আলোচ্য বিধিমালা অনুসারে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সার্ভিস বহি, শ্রম রেজিস্টার, ছুটি রেজিস্টার রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ছাঁটাই, ডিসচার্জ, অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত নিয়মাবলি বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া এই বিধির তৃতীয় অধ্যায়ে কিশোর শ্রমিকের বয়স ও সক্ষমতার প্রত্যয়নপত্র, কাজের সময়সহ বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাদের নিয়োগ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে গর্ভবতী মহিলা শ্রমিকের প্রতি মালিক ও অন্যান্য শ্রমিকের দায়িত্ব কী হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে এই বিধির বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রমিকের স্বাস্থ্য, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, মজুরি, ভবিষ্যৎ তহবিল, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি বিষয়-সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। শ্রম আইন, (২০০৬) ও শ্রম বিধিমালা, (২০১৫) পালনে ও প্রয়োগে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ভিন্নতা দেখা না দেয় সে লক্ষ্যে এই বিধিমালায় ৮১টি নির্ধারিত ফরম প্রদান করা হয়েছে। বেশ দেরিতে হলেও এই বিধিমালা প্রবর্তন শ্রম আইন প্রয়োগে ও বাস্তবায়নে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

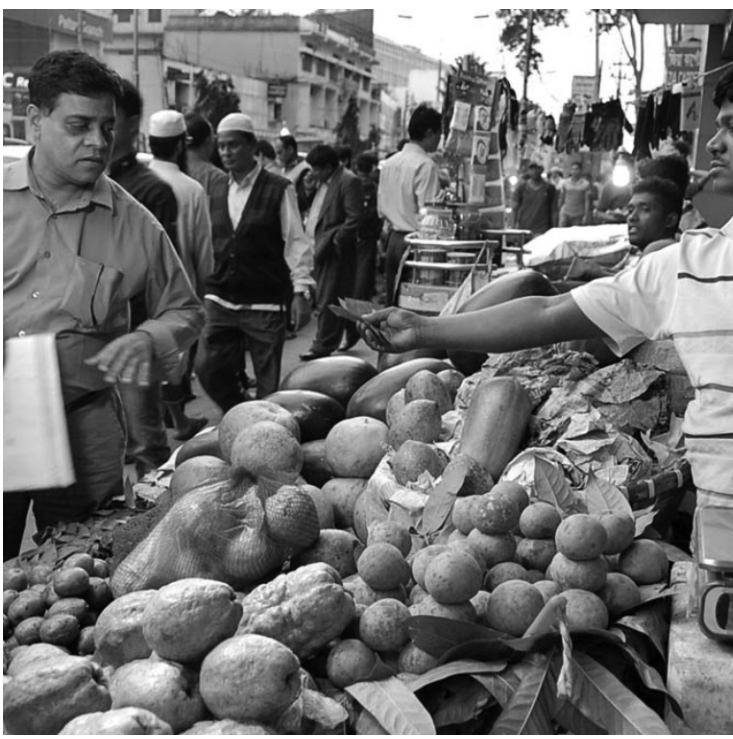

খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন মেশানোর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫

ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহণ, মজুত, বিক্রয় ও এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করে। এই আইনানুসারে কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স ছাড়া ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহণ, মজুত, বিক্রয়, ব্যবহার বা দখলে রাখতে পারবে না। লাইসেন্স প্রদান ও তত্ত্বাবধান-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বিধি দ্বারা পরিচালিত হবে। অত্র আইনের ৯ ধারায় প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে যে, জেলা প্রশাসক বা তাঁর অধস্তন কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা বেআইনি ও লাইসেন্সবিহীন ফরমালিন তল্লাশি, তদন্ত, আটক ও বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। এই আইনের ২০ থেকে ৩৫ ধারা পর্যন্ত অপরাধ,

অপরাধের বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ধারা ২০ অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স ছাড়া ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন বা মজুত করেন, তাহলে তিনি এই আইনে অপরাধ করেছেন বলে বিবেচিত হবেন এবং শাস্তি হিসাবে তাঁকে অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং এর অতিরিক্ত অনধিক ২০ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যা কোনোভাবেই ৫ লাখ টাকার নিচে নয়। একইভাবে এই আইনের ২২ ধারায় লাইসেন্স ছাড়া ফরমালিন বিক্রয় বা ব্যবহারের অপরাধে শাস্তি হিসাবে অপরাধীকে অনধিক দুই বছরের কারদণ্ড যা ছয় মাসের কম নয় বা অনধিক ৪ লাখ টাকা জরিমানা যা ১ লাখ টাকার নিচে নয় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, ২৩ ধারায় লাইসেন্স ছাড়া ফরমালিন পরিবহণ বা দখলে রাখলে অপরাধীকে অনধিক দুই বছরের কারাদণ্ড যা ছয় মাসের কম নয় বা অনধিক ৩ লাখ টাকা জরিমানা যা ১ লাখ টাকার নিচে নয় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, ২৪ ধারায় ফরমালিন উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য উপাদান ও যন্ত্রপাতি মজুত রাখার জন্য অপরাধীকে অনধিক দুই বছরের কারাদণ্ড যা ছয় মাসের কম নয় এবং এর অতিরিক্ত অনধিক ২ লাখ টাকা জরিমানা যা ৫০ হাজার টাকার কম নয় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, ২৮ ধারায় পুনরায় একই অপরাধ সংঘটিত করলে দণ্ড হিসেবে আইনটির ২০ ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দণ্ড রয়েছে তার দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ ছাড়া ৩০ ধারায় কোনো কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটিত হলে এর দায়ভার কার ওপর বর্তাবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এই আইনের অধীনে হয়রানিমূলক মামলা রোধকল্পে ২৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তি বিরুদ্ধে মিথ্যা বা হয়রানিমূলকভাবে মামলা দায়ের করে, তবে ওই ব্যক্তি অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড যা ৩ মাসের কম নয় বা অনধিক ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড যা ৫০ হাজার টাকার কম নয় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। তা ছাড়া আইনের ৩৪ ও ৩৫ ধারায় অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে আদালতের এখতিয়ার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এই আইনের অধীন ২০ ও ২১ ধারায় সংঘটিত অপরাধগুলো বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪-এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালে বিচার্য হবে। আর অন্যান্য অপরাধ বিচারের জন্য প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটকে এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে, তবে ২০ ও ২১ ধারার অপরাধ দুটি ছাড়া অন্য সব অপরাধ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০১ অনুসারেও বিচার করা যাবে।

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, জ্বালানি সংরক্ষণ সহ গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎকর্ষসাধনে সরকার গত ২ ফেব্রুয়ারি এই আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইনবলে সরকার বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করবে। আইনের ৫ ধারায় কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাউন্সিলের কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই আইনের ৭ ধারায় একটি গভর্নিং বডি প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে। যে বডিতে সরকার কর্তৃক মনোনীত দুজন বিদ্যুৎ বা জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ বা গবেষক থাকবেন, যাতে গবেষণা ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। আইনটির অন্যান্য ধারায় কাউন্সিলকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য এর বাজেট, তহবিল, ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা, সভা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫

এ বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ প্রণয়নের মাধ্যমে ২০১০ সালে প্রণীত পলিসি অ্যান্ড স্ট্র্যাটিজি ফর পাবলিক, প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) নীতিমালাটি রহিত করা হয়। নতুন এই আইনটির মূল লক্ষ্য হলো সরকার ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ততায় সৃষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারত্বকে একটি আইনি কাঠামো প্রদান করা। এই আইনের ৪ ধারায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা পিপিপি কর্তৃপক্ষ নামে পরিচিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পিপিপি কর্তৃপক্ষের একটি বোর্ড অব গভর্নরস থাকবে, যা কর্তৃপক্ষের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ১৮ ধারায় চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি কী হবে তা বলা হয়েছে। এ ছাড়া এই ধারাতে বলা হয়েছে, পিপিপি প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, সে ক্ষেত্রে জবাবদিহির প্রশ্ন থেকেই যায়, কারণ পিপিপির আওতাধীন প্রকল্পে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা রকম অনিয়ম যেমন চোখে পড়ে তেমনি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পকাজ সম্পন্ন হয় না, তাই এই ধারাটির পাশাপাশি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের বিধানও

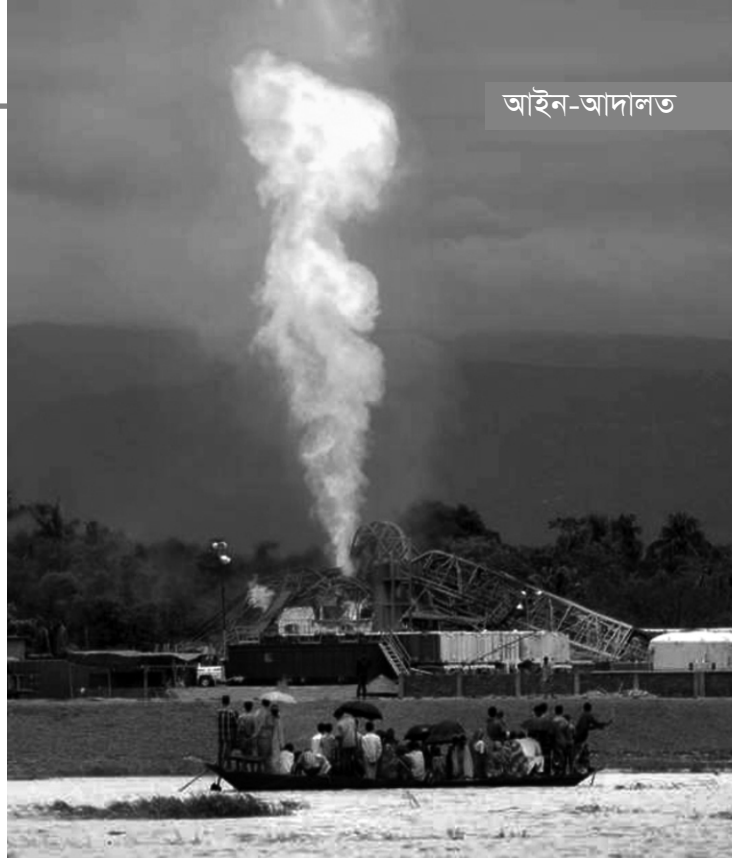

আইনটিতে থাকার প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১০ সালের জুন মাসে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ঢাকার গুলিস্তান থেকে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। যা নির্ধারিত সময়সীমা চারবার বৃদ্ধি করার পর গত ১১ অক্টোবর, ২০১৩ ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ৪৫ ধারায় পিপিপি কর্তৃপক্ষকে প্রবিধি (রেগুলেশন) প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তাই আইনটিকে প্রয়োগ উপযোগী করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব প্রবিধি প্রণয়ন করা জরুরি।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কার্যক্রমকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় আনা, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ৬ সেপ্টেম্বর এই আইন পাস হয়। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকদের হিসাব ও নিরীক্ষায় জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা আনার জন্য এই আইনের ৩ ধারায় ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এই আইন অনুসারে সকল নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্মকে অবশ্যই ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধিত না হয়ে কোনো নিরীক্ষক ও নিরীক্ষাপ্রতিষ্ঠান জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের হিসাব ও নিরীক্ষা করতে পারবে না। ৪৮ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো শর্ত ভঙ্গ করে বা অসাধু পন্থায় নিরীক্ষক হিসেবে নিবন্ধিত হয়, তাহলে উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ বছরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। মূলত এ আইনের মাধ্যমে দেশের হিসাব ও নিরীক্ষা-সেবায় জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনা হয়েছে।

সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫

The Official Vehicles (Regulation of use) Ordinance, 1986 বাতিল করে গত ৫ মার্চ সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫ প্রণীত হয়। আইনটির মূল লক্ষ্য হলো সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক সরকারি যানবাহনের অপব্যবহার রোধ করা। এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করলে অপরাধীকে জরিমানার পাশাপাশি শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে বিচারের সম্মুখীন করা যাবে। আলোচ্য আইনটি বাস্তবায়নে ও যথাযথ প্রয়োগে আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী সরকার বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য একটি কোম্পানি গঠন ও এ-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় পরিচালনার স্বার্থে পামাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫ প্রণীত হয়েছে। আইনটিতে সর্বমোট ৩৫টি ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে। আইনের ৪ ধারায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি গঠন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যেটি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালন সংস্থা (Operating Organization) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। ৭ ধারায় সবিস্তারে কোম্পানির যাবতীয় কার্যাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আইন অনুসারে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং দক্ষ পরিচালনার জন্য সার্বিকভাবে দায়ী থাকবে। সে ক্ষেত্রে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্রের পারমাণবিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে এর সঙ্গে জড়িত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদেশি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব কী হবে এবং কীভাবে তা পরিমাপ করা হবে সে-সম্পর্কিত কোনো নির্দেশনা এই আইনে নেই। এ ছাড়া এ আইনের আওতায় স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে এর দায়দায়িত্ব কীভাবে নির্ধারণ করা হবে, তার কোনো নির্দেশনা আইনটিতে প্রদান করা হয়নি। তাই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা আইনটিতে থাকা প্রয়োজন।

২০১৫ সালে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪টি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উপরোক্ত আইনগুলি ছাড়াও এ বছর পাস হয়েছে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, নির্দিষ্টকরণ আইন, নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, অর্থ আইন, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন আইন। ■

তথ্যসূত্র

১. বুলেটিন, মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর, ২০১৫

২. bdlaws.minlaw.gov.bd/

হোসেনী দালানে বোমা বিস্ফোরণ

মাহমুদা হৃদিয়া রশ্মি

পবিত্র আশুরা উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এ বছরও পুরান ঢাকার হোসেনী দালান থেকে তাজিয়া মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য অসংখ্য মানুষ আসেন সেখানে। দুলদুল ঘোড়াকে সাজানোসহ সব প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন এবং মিছিল বের হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ২৩ অক্টোবর ২০১৫ দিবাগত রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে (২৪ অক্টোবর) একটি বোমা বিস্ফোরিত হলে হোসেনী দালানের অভ্যন্তরে কবরস্থানের পার্শ্ববর্তী মেইন গেটের রাস্তার লাইটের পিলারের সঙ্গে লাগানো টিউবলাইট ও সিসি ক্যামেরাটি ফেটে যায়। এরপর ১/২ মিনিটের মধ্যে পরপর আরো তিন-চারটি বোমা বিস্ফোরিত হলে শতাধিক মানুষ আহত হন। আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল ও একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয়। আহতদের মধ্যে সাজ্জাদ হোসেন সানজু নামে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রের এবং মো. জামাল উদ্দিনের মৃত্যু হয়। তারা দুজনই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং অনুষ্ঠানটি শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক আয়োজন করা হলেও এতে সুন্নি সম্প্রদায়ের লোকজনও অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক হামলার ঘটনা ঘটলেও বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও আহতদের বক্তব্য

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ১০১, ১০২, ২০৪ ও ২০৬ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া মোট আহতের সংখ্যা ১৬ জন। এঁদের মধ্যে একজন ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন এবং একজন গুরুতর আহত অবস্থায় আইসিইউতে ভর্তি আছেন। যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের কিছুসংখ্যক নারী-পুরুষ একই পরিবারের সদস্য। এমনই একজন হচ্ছেন পুরান ঢাকার ছুড়িটোলার বাসিন্দা ও ফেয়ার ফ্যাশন নামে একটি গার্মেন্টসের প্রিন্টমাস্টার আহত কামাল (২৬)। আসক প্রতিনিধিদের কামাল জানান, প্রতিবছরের মতো এ বছরও তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্য– বড় ভাই রিপন, খালাতো দুই ভাই মনির ও নূর হোসেন এবং মনিরের স্ত্রী হালিমা বেগম ও তাঁর দেড় বছরের শিশু সন্তান কায়েসকে নিয়ে রাত দেড়টার দিকে বাসা থেকে বের হন হোসেনী দালানের উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁরা তাজিয়া মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য দালানের ভেতরের মূল ফটকের পার্শ্ববর্তী কবরস্থানের পাশে পতাকা নিয়ে লাইনে দাঁড়ান। সেখানে দুটি ঘোড়াকে সাজানো হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে (রাত আনুমানিক পৌনে ২টা) একটি বোমা বিস্ফোরিত হলে পুরো এলাকাটি অন্ধকার হয়ে যায়। এতে উপস্থিত লোকজন ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে অনেকেই মাটিতে পড়ে যান। প্রথম বোমাটি বিস্ফোরণের পরপরই আরো দুটি বোমা বিস্ফোরিত হলে তৃতীয় বোমার কিছু স্প্লিন্টার তাঁর হাঁটুর নিচের অংশে লাগে। বোমা বিস্ফোরণে তিনি ছাড়াও তাঁর পরিবারের আরো পাঁচজন আহত হয়েছেন এবং আহত অবস্থায় দৌড়ে তিনি নাজিমউদ্দিন রোডে এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নেন। পরে আত্মীয়রা তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। পরিবারের আহত অন্য সদস্যদের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি জানান, রিপন মনির, নূর হোসেন এখন শঙ্কামুক্ত। তবে মনিরের দেড় বছরের বাচ্চা কায়েসের এক্স-রের মাধ্যমে দুই পায়ে ও ঘাড়ে স্প্লিন্টারের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। বাচ্চাটিকে নিয়ে পরিবারের সবাই উদ্বিগ্ন। ডাক্তার এখনো স্প্লিন্টার অপসারণের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি। তিনি আরো জানান– তাঁদের পরিবারের সবাই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত।

পেশায় একটি প্রাইভেট কোম্পানির কর্মকর্তা আহত রাকিব। তিনিও ঘটনার একই রকম বর্ণনা দিয়ে জানান, রাত আনুমানিক পৌনে ২টার দিকে বোমা বিস্ফোরিত হলে একটি বোমার স্প্লিন্টার তাঁর দুই পায়ে ও পেটের খাদ্যনালিতে ঢুকে যায়। তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং জ্ঞান ফিরে নিজেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেখতে পান। তিনি আরো জানান, গত ২৫.১০.২০১৫ তারিখ দুপুর ১টার দিকে তাঁর খাদ্যনালিতে অপারেশন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান, তাঁরা কোনো পূর্বসতর্কতার সংকেত পাননি। এমনকি দালানের ভেতরের অবস্থা এত শান্তিপূর্ণ ছিল যে, নিরাপদভাবেই নারী-পুরুষেরা মিছিলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি, পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানটিতে এত বড় একটা ঘটনা ঘটতে পারে।

শুভাঢ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে আসা নিহত সানজুর খালা আয়শা বেগম (৫০) জানান, তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কেরানীগঞ্জ থেকে রাত সাড়ে ১০টার দিকে বের হয়ে রাত দেড়টার দিকে হোসেনী দালানে পৌঁছান। সেখানে যাওয়ার পর দেখতে পান, দুলদুল ঘোড়াকে সাজিয়ে বের করা হবে, ঠিক তখনই প্রথমে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরে আয়েশা বেগম জানান, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও মনের ভক্তি থেকে তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ তাজিয়া মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য হোসেনী দালানে আসেন এবং যত দিন বেঁচে থাকবেন তিনি এই মিছিলে অংশগ্রহণ

করবেন। তিনি আরো জানান, জেলা প্রশাসক হাসপাতালে এসে চিকিৎসার জন্য তাঁকে ৫ হাজার টাকা দিয়েছেন। তিনি আরো জানান, তাঁর বোনের ছেলে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাজ্জাদ হোসেন সানজুর পিঠের বাঁ দিক দিয়ে স্প্লিন্টার ঢুকে পেট দিয়ে বের হয়। তাকে দ্রুত হাসপাতালে আনা হলে সেখানে সে মারা যায়। সানজুর মৃত্যুতে তাঁদের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এ ছাড়া তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে মেয়ে সুমি, নাতনি স্নেহা, নাতি রাজন ও ছোট বোন আহত হয়েছেন। তাঁরা সবাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

২৫ অক্টোবর ২০১৫ বিবিসি বাংলায় প্রকাশিত সংবাদসূত্রে জানা যায়, তাজিয়া মিছিলে যাবার ব্যাপারে খুবই ইচ্ছা প্রকাশ করছিল সানজু। ঘটনার পর সানজুকে নিয়ে যখন হাসপাতালে ছুটছিলেন, তখন কারো সাহায্য পাননি– কথাটি বলেছিলেন তার মা রাশেদা। ঘটনার পর থেকে পুলিশ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যাওয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কেউ এখনো তাঁদের বাড়িতে আসেননি বরং তাঁদের পুলিশ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যাওয়ার জন্য বারবার ডাকা হচ্ছে, এমনকি অনেক রাত পর্যন্ত তাঁদের থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছে বলে জানান সানজুর বাবা মো. নাসের।

হোসেনী দালানে অংশগ্রহণকারী আহত রিনা বেগম (৩৮) জানান, ছেলের 'মানত' ছিল। মানত পূরণ করার উদ্দেশ্যেই তিনি হোসেনী দালানে এসেছিলেন। বোমা বিস্ফোরণে তাঁর শরীরের কিছু অংশ, হাত ও দুই পায়ে আংশিক পুড়ে যায় এবং তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলে হাসানের হাত ও মুখের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাজিয়া মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য হোসেনী দালানে এসেছিলেন ২২ কাজী জিয়ার উদ্দিন রোড, শাহি মসজিদ, চকবাজার, ঢাকা থেকে ফেরিওয়ালা মো. জামাল (৫৫)। বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউর ৬ নম্বর বেডে ভর্তি করা হয় এবং ২৯ অক্টোবর তিনি মারা যান।

ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত তথ্য

২৬.১০.১৫ তারিখে আসক প্রতিনিধিরা তথ্যানুসন্ধানে হোসেনী দালানে উপস্থিত হলে সেখানকার নিরাপত্তার কাজে ভলান্টিয়ার হিসেবে দায়িত্বরত সৈয়দ গোলাম মহসিনের সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান, নিরাপত্তার জন্য পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যরা ওই সময় ওই এলাকায় মোতায়েন ছিলেন। মোনাজাত পর্বও সম্পন্ন হয়েছে। তাঁরা নিরাপত্তার কাজে দালানের দ্বিতীয় তলার ছাদে অবস্থান করছিলেন। কয়েকজন পুলিশসহ জেলা প্রশাসক হোসেনী দালানটি পর্যবেক্ষণ করে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। পরপর তিন-চারটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনেকে ভয়ে পালানোর চেষ্টা করেছেন। ১২০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন, তার মধ্যে গুরুতর আহতের সংখ্যা ছিল ৫৭ জনেরও বেশি। তিনি আরো জানান– হোসেনী দালানের বাইরে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে ব্লাড ডোনেশনে ক্যাম্প বসানো হয়েছিল। তাদের একটি অ্যাম্বুলেন্স ছিল। সেই অ্যাম্বুলেন্সে স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে আগত অ্যাম্বুলেন্সে আহতদের হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি বোমা উদ্ধার করেন। এ ছাড়াও ফরেনসিক বিভাগের একটি টিম এসে ঘটনাস্থল থেকে লাইট ভাঙা কাচসহ অন্যান্য আলামত সংগ্রহ করেছেন।

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী তাজিয়া মিছিল

আইনশৃখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে পূর্বসতর্কতামূলক নির্দেশনার ব্যাপারে তিনি জানান, ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করতে যতটুকু তথ্য জানা দরকার, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ততটুকু তথ্য তাদের দিয়েছেন। সুতরাং, তাঁরা বেশি তথ্য জানেন না।

থানার বক্তব্য

ফরেনসিক বিভাগের একটি টিম ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করে নিয়ে যায় এবং পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি বোমা উদ্ধার করে। সন্দেহভাজন হামলাকারী হিসেবে শফিকুল ইসলাম, মোরসালিন, আব্দুল কাদির জিলানীসহ চার যুবককে আটক করেছে পুলিশ এবং চকবাজার থানার এসআই জালাল উদ্দিন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

২৬ অক্টোবর *দৈনিক জনকণ্ঠ* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসূত্রে জানা যায়, ঘটনা তদন্তের জন্য ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার শেখ মোহাম্মদ মারুফ হাসানকে প্রধান করে এবং যুগ্ম কমিশনার মীর রেজাউল আলম এবং গোয়েন্দা ও অপরাধ তথ্য বিভাগের দক্ষিণ বিভাগের উপকমিশনার মাশরুকুর রহমান খালেদের সমন্বয়ে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ। ঢাকা মহানগর পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপ-কমিশনার মো. মফিজউদ্দিন আহমেদ জানান, রবিবার দুপুরে চকবাজার থানার এসআই জালাল উদ্দিন আহমেদ বাদী হয়ে সন্ত্রাস দমন আইনে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন। ডিএমপির উপ-কমিশনার (ডিসি-মিডিয়া) মুনতাসিরুল ইসলাম রোববার রাত ৯টা ৪০ মিনিটে জানান, মামলাটি বিকেলে ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়েছে। ■

মা-ছেলেকে বর্বর নির্যাতন

পুলিশের গুলিতে চারজনের মৃত্যু

অনির্বান সাহা

টাঙ্গাইলের ঘাটাইল থানার আঠারদানা গ্রামের ১৭ বছরের কিশোর আল আমিন। রাজমিস্ত্রির জোগালির কাজ করে সে। মাস ছয়েক আগে পার্শ্ববর্তী কালিহাতী থানার সাতুটিয়া গ্রামের প্রভাবশালী রফিকুল ইসলাম রোমাদের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে তার আলাপ হয় রোমার তৃতীয় স্ত্রী হোসনে আরার সঙ্গে। তখন হোসনে আরা তার ওপর স্বামীর নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের কথা আল আমিনকে জানায়। এক পর্যায়ে হোসনে আরার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবারের রোজার ঈদের আগে হোসনে আরা টাঙ্গাইল কোর্টে গিয়ে তার স্বামী রোমাকে তালাক দেয় এবং অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে আল আমিনকে বিয়ে করে। এরপর কিছুদিন তারা ঢাকার আশুলিয়ায় একটি বাসা ভাড়া করে থাকে। কিন্তু আল আমিনের মা-বাবার চাপে মাস খানেক পর তারা ঘাটাইলে আল আমিনদের বাড়িতে ফিরে আসে। তখন সালিশ-দরবারের মাধ্যমে হোসনে আরাকে তার আগের স্বামী বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু কয়েক দিন পর হোসনে আরা নির্যাতনের কারণে স্বামীর বাড়ি থেকে পালিয়ে আবারও আল আমিনের কাছে চলে আসে। এর জের ধরে গত ১৫ সেপ্টেম্বর হোসনে আরার স্বামী রোমা আল আমিন ও তার মা ছাহেরা বেগমকে তাঁদের (রোমা) বাড়িতে ধরে নিয়ে মা-ছেলের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালান। রোমা ও তাঁর বাড়ির অন্য সদস্যরা মিলে আল আমিনকে বেধড়ক মারধরের এক পর্যায়ে তাকে পুরোপুরি বিবস্ত্র করে ফেলেন এবং জোরপূর্বক তার মাকেও অর্ধবিবস্ত্র করেন। এরপর ছেলেকে দিয়ে মায়ের শ্লীলতাহানি ঘটান। সে সময় মা-ছেলের চিৎকার শুনে কালিহাতী থানায় ফোন করে তাদের উদ্ধারের জন্য অনুরোধ জানান রোমাদের পাশের বাড়ির লোকজন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পরও পুলিশ মা-ছেলেকে উদ্ধার না করায় এলাকার কিছু মানুষ প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে যান। মা-ছেলের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের এই ঘটনা জানার পর ইউএনওর নির্দেশে আল আমিন ও তার মাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। কালিহাতী থানায় আল আমিনের মা ছায়েরা বেগম বাদী হয়ে নির্যাতনকারী রোমা, তার ভগ্নীপতি হাফিজ এবং কাজী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। পরে পুলিশ গুরুতর আহত মা-ছেলেকে টাঙ্গাইল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

আল আমিনদের প্রতিবেশী মো. মনির হোসেন জানান, আসামি রফিকুল ইসলাম রোমা ও তাঁর ভাইয়েরা এলাকায় অনেক প্রভাবশালী। তাঁরা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় ঘটনার সময় কেউ তাঁদের বাড়িতে ঢুকে প্রতিবাদ জানানোর সাহস পায়নি। তা ছাড়া কালিহাতী থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ঘটনার পরে প্রত্যাহারকৃত) রোমার ভগ্নীপতি হাফিজের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তিনি নির্যাতনকারী রোমা ও হাফিজকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। তবে পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসীর চাপে পুলিশ প্রথমে রোমাকে গ্রেফতার করলেও অন্য দুজন আসামিকে গ্রেফতারে গড়িমসি করে। এ কারণে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। মা-ছেলের ওপর বর্বর নির্যাতন এবং পুলিশ কর্তৃক আসামিদের বাঁচানোর চেষ্টার ঘটনাটি লোকমুখে কালিহাতী-ঘাটাইলের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবাদে মুখর হন এলাকাবাসী। ১৮ সেপ্টেম্বর বিকাল আনুমানিক ৪টার দিকে নির্যাতনকারীদের বিচারের দাবিতে ঘাটাইল থানা এলাকার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কসংলগ্ন হামিদপুর বাজারে সমবেত হন বিক্ষুব্ধ প্রায় ২/৩ হাজার মানুষ। সমবেত মানুষ মিছিল করার উদ্যোগ নিলে বাধা দেয় পুলিশ। এক পর্যায়ে শুরু হয় পুলিশ-জনতা উভয় পক্ষের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া। তখন আচমকা গুলিবর্ষণ করে পুলিশ। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী সালঙ্কা গ্রামের (ঘাটাইল থানা) শামীম নামে এক যুবক। অন্যদিকে একই ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হামিদপুর বাজার থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরবর্তী কালিহাতী বাসস্ট্যান্ড এলাকায়ও। বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে ছোট একটি মিছিল কালিহাতী থানার নিকটবর্তী সাতুটিয়া ব্রিজের দিকে যাওয়ার সময় খুব কাছ থেকে (আনুমানিক পাঁচ-ছয় হাত দূরত্ব) আচমকা গুলিবর্ষণ করে পুলিশ। সে সময় গুলিবিদ্ধ হন মিছিলের মধ্যে থাকা কয়েকজন। গুলিবিদ্ধদের মধ্যে হামিদপুরের ঘটনায় একজন এবং কালিহাতী বাসস্ট্যান্ডের ঘটনায় তিনজনসহ মোট চারজন মানুষ মারা যান। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত এ ঘটনার বিষয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর আসক প্রতিনিধিদের সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধানকালে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য থেকে উল্লেখিত তথ্যাদি জানা যায়।

তথ্যানুসন্ধানে আসক প্রতিনিধিরা বিক্ষোভ ও গুলিবর্ষণের প্রথম ঘটনাস্থল হামিদপুর বাজার বাসস্ট্যান্ডে উপস্থিত হলে সেখানকার একজন প্রত্যক্ষদর্শী আসক প্রতিনিধিদের জানান, ছেলেকে দিয়ে মাকে লাঞ্ছনার ঘটনাটি মেনে নিতে পারেননি কালিহাতী-ঘাটাইল এলাকার মানুষ। তাই এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ মানুষ নির্যাতনকারীদের বিচারের দাবিতে প্রথমে বৃহস্পতিবার (১৭.০৯.১৫) বিকালে হামিদপুরে বাজারে ছোট একটি মিছিল করেন। মিছিল শেষে তাঁরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করেন, মায়ের ওপর লাঞ্ছনার ঘটনার আরো কড়া প্রতিবাদ হওয়া দরকার এবং এই লক্ষ্যে পরদিন শুক্রবার (১৮.০৯.১৫) আরো মানুষজন একত্রিত হয়ে হামিদপুর বাজারে বড় আকারে মিছিল করবেন। সেই মোতাবেক শুক্রবার

বিকাল আনুমানিক ৪টার দিকে পার্শ্ববর্তী দিঘলকান্দি ও দিগর ইউনিয়নের গ্রামগুলো থেকে আনুমানিক প্রায় ২/৩ হাজার লোক হামিদপুর বাজারে (টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়ক) সমবেত হন। এ দিন সকাল থেকেই ঘাটাইল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই ওমর ফারুকের নেতৃত্বে এক গাড়ি পুলিশ হামিদপুর বাজারে টহল দেয়। সকালে ওমর ফারুক স্থানীয় লোকজনকে উদ্দেশ করে বলেন, 'এখানে কে/কারা মিছিল করে দেখে নেব।' বিকালে অনেক লোকের সমাগম দেখে ঘাটাইল থানা থেকে আরো এক গাড়ি এবং কালিহাতী থানা থেকে দুই গাড়ি পুলিশসহ আনসাররা হামিদপুর বাজার বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান নেয়।

এক পর্যায়ে বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৪টার দিকে সমবেত লোকজন মিছিল করতে গেলে এসআই ওমর ফারুক ও তাঁর সঙ্গীয় পুলিশ বাহিনী বাধা দেয়। তখন মিছিলকারীরা উত্তেজিত হয়ে উঠলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও টিয়ার শেল ছোড়ে। সে সময় মিছিলকারীদের কেউ কেউ পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছোড়ে এবং পুলিশ-জনতা উভয় পক্ষের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু করলে লোকজন দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। সে সময় বাজারের পার্শ্ববর্তী শালঙ্কা গ্রামের শামীম পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কালিহাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে তাকে টাঙ্গাইল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। টাঙ্গাইল মেডিক্যালে নেওয়ার পর মারা যান শামীম।

পুলিশের গুলিবর্ষণের দ্বিতীয় ঘটনাস্থল, কালিহাতী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নিহত ফারুকের ভাই ফলবিক্রেতা মাসুম আসক প্রতিনিধিদের জানান, মা-ছেলের নির্যাতনের প্রতিবাদে ও হামিদপুরে পুলিশের গুলিতে একজন মারা যাওয়ার খবরে বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৪টার দিকে কালিহাতী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় উপস্থিত লোকজনের মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তখন মাসুম তার ফলের দোকান বন্ধ করে পাশের ছোট একটা গলির মধ্যে অবস্থান নেন। বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সে সময় হাজার খানেক লোক ছিল। তা ছাড়া হামিদপুরে গন্ডগোলের কারণে মেইন রোডের (টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়ক) গাড়িগুলো রাস্তায় থেমে থাকায় গাড়ির সব প্যাসেঞ্জার রাস্তার ওপর নেমে আসে। এরই মধ্যে হামিদপুরে পুলিশের গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে বাসস্ট্যান্ড থেকে ২০-২৫ জনের একটি ছোট মিছিল শুরু হয়। তখন গলির মাথায় এসে খানিকটা দূর থেকে মাসুম দেখেন, মিছিলকারীরা পুলিশের দিকে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে কালিহাতী থানার দিকে সাতুটিয়া ব্রিজের কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছেন। তখন ব্রিজের কাছাকাছি টহল দিচ্ছিলেন পাঁচ-ছয়জন পুলিশ সদস্য; তাঁদের মধ্য থেকে একজন মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। এরপর হঠাৎ খুব কাছ থেকে (আনুমানিক পাঁচ-ছয় হাত দূরত্ব) মিছিলকে লক্ষ্য করে রাইফেল দিয়ে ৫/৭ রাউন্ড গুলি করে পুলিশ। মিছিলের মধ্যে থাকা তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান। পরে তিনি লোকমুখে জানতে পারেন, তাঁর ভাই ফারুকও ওই মিছিলে গুলিবিদ্ধ হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে কালিহাতী হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর তিনি দৌড়ে হাসপাতালে গেলেও ভাইকে আর জীবিত অবস্থায় দেখতে পাননি। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরে মাসুম জানান, তাঁর ভাই ফারুক একটু সহজ-সরল প্রকৃতির ছিল। ওই দিন ফারুক বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করে বাড়িতে ফিরছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে মিছিল দেখে তিনি কৌতূহলবশত মিছিলের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তখনই তাঁর গায়ে গুলি লাগে। মাসুম বলেন, খুব কাছ থেকে পুলিশ অতর্কিত গুলি করে তাঁর ভাইসহ নিরীহ মানুষদের মেরেছে। তিনি তাঁর ভাইয়ের হত্যার বিচার দাবি করেন।

থানা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

মা-ছেলেকে নির্যাতনের ঘটনায় গত ১৫.০৯.২০১৫ তারিখে আল আমিনের মা মোছা. ছায়েরা বেগম বাদী হয়ে কালিহাতী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ সংশোধনী (২০০৩) এবং দণ্ডবিধি ৩৪২/৩২৩ ধারায় একটি মামলা (নং-১৬) দায়ের করেন। এই মামলার আসামিদের মধ্যে রফিকুল ইসলাম রোমা ও তার ভগ্নীপতি হাফিজুর রহমান হাফিজকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

অন্যদিকে বিক্ষোভ ও গুলির ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে কালিহাতী থানায় ৩০০/৪০০ জন অজ্ঞাতনামা আসামি এবং ঘাটাইল থানায় অজ্ঞাত ৫০০/৬০০ জনকে আসামি করে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে। মামলা দুটি বর্তমানে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তদন্ত করছে। ঘটনার পরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কালিহাতী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ঘটনার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি) শহিদুল ইসলাম, এসআই আবুল বাশার ও এসআই ছলিমউদ্দিনসহ দুজন কনস্টেবলকে প্রত্যাহার করা হয় এবং ঘাটাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও এসআই মুনসুফ আলীসহ দুজন কনস্টেবলকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ঘটনায় মাননীয় হাইকোর্টের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে টাঙ্গাইলের অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক সরোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি এবং পুলিশের একজন ডিআইজির নেতৃত্বে অপর একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত তদন্ত কমিটি দুটিকে ৬০ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় হাইকোর্ট।

সর্বশেষ

১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের সংবাদ পত্রিকা সূত্রে জানা যায়– টাঙ্গাইলে চার জনের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। এই রিপোর্টে কালিহাতি ও ঘাটাইল থানার দুই ওসিসহ ৭ জনকে সাময়িক বরখাস্ত ও জেলা এসপির দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিসিসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। মিথ্যা তথ্য দেয়ার জন্য দুইজন ও সরাসরি গুলি করার জন্য দুইজন সাব-ইন্সপেক্টর জড়িত বলে তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। ■

নারায়ণগঞ্জের সাত খুন

লিয়াকত আলী সবুজ

২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের লিংক রোড থেকে একসঙ্গে সাতজনের অপহরণ ও পরে হত্যার ঘটনা আমাদের অজানা নয়। আদালতে আসামিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও পুলিশের দেয়া অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, প্রধান আসামি নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের তৎকালীন কাউন্সিলর নূর হোসেনের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে অপর কাউন্সিলর নজরুল ইসলামকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে র‍্যাবের সাবেক তিন কর্মকর্তা। নজরুল ইসলামকে তাঁর সহযোগীদেরসহ অপহরণের সময় অ্যাডভোকেট চন্দন কুমার দেখে ফেলায় তাঁকেও তাঁর ড্রাইভারসহ অপহরণ করা হয়। অপহরণের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নির্মমভাবে খুন করে অপহরণকৃত সাতজনকে। পেট চিরে ইট বেঁধে দিয়ে সকলকে শীতলক্ষ্যার

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের আপিল কার্যক্রম

সমীর কর্মকার

পিলখানা হত্যাকাণ্ড মামলা বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে আসামি সংখ্যার দিক থেকে সর্ববৃহৎ ফৌজদারি মামলা। যে মামলায় সর্বমোট ৮৪৬ জনকে বিচারের আওতায় আনা হয়। বিচার কার্যক্রম শেষে গত ৫ নভেম্বর ২০১৩ আদালত ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ১৬১ জনকে যাবজ্জীবন ও ২৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। আদালত অভিযুক্তদের হত্যা, হত্যার চেষ্টা, ষড়যন্ত্র, ধারালো অস্ত্র ও বস্তু দ্বারা আঘাত, উসকানি দেয়া, অফিসার ও তাদের পরিবারকে জিম্মি করা, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, অনুমতি ব্যতীত অস্ত্র ব্যবহার, চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ধ্বংসের অপরাধে শাস্তি দেয়।

২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ ঢাকার পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের সময় এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়, তাতে প্রাণ হারান ৭৪ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি। পৈশাচিক এই অপরাধের বিচার কোন আইনে হবে, তা নিয়ে শুরুতেই বিতর্কের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, বিদ্রোহ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিচার হবে বিডিআরের নিজস্ব আইনে অন্যদিকে হত্যা, হত্যাচেষ্টা, লুটসহ অন্যান্য অপরাধের বিচার হবে দেশের প্রচলিত আইনে। বিডিআরের নিজস্ব আইনে বিচারের উদ্দেশ্যে মোট ১১টি বিশেষ আদালত ও ৬০টি সংক্ষিপ্ত আদালত গঠন করা হয়। পিলখানা অপরাধের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ লালবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করে। সিআইডি মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে ৮২৪ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করে। পরবর্তী সময় সম্পূরক চার্জে আরো ২৬ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। সর্বমোট ৮৪৬ জন আসামির বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম শেষে আদালত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবনসহ নানা মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রায় ঘোষণার পর ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসেই মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ১৫২ আসামির মধ্যে আটক ১৩৮ আসামির রায়ের অনুলিপি কারাগারে পাঠানো হয়। অনুলিপি পাবার পর আটক ১৩৮ জন আসামি কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে আপিল করে। কিন্তু বন্দি অবস্থায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন আসামি মারা যাওয়ায় উচ্চ আদালতে বর্তমানে ১৩৭ জন আসামির আপিল আবেদন শুনানির জন্য রয়েছে। পাশাপাশি যাবজ্জীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরাও নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন। তবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৪ আসামি পলাতক থাকায় তাদের পক্ষে হাইকোর্টে কোনো আপিল আবেদন করা হয়নি।

পিলখানা হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত প্রত্যেক আসামির Death Reference (মৃত্যু নিশ্চিতকরণ) সংক্রান্ত শুনানির জন্য

মাছের আহারে পরিণত করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু তিন দিন পর নদীতে লাশ ভেসে উঠলে ধীরে ধীরে ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হতে থাকে।

আলোচিত এ ঘটনায় নিহত নজরুল ইসলামের স্ত্রী সেলিনা ইসলাম ও নিহত চন্দন কুমারের জামাতা বিজয় কুমার পাল বাদী হয়ে নারায়ণগঞ্জের দুটি পৃথক থানায় দুটি মামলা দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে গ্রেফতার করা হয় র‍্যাব-১১-এর সাবেক অধিনায়ক তারেক সাঈদ মোহাম্মদ, মেজর আরিফুর রহমান ও লে. কমান্ডার এম এম রানাকে। কিন্তু মামলার ১ নম্বর আসামি নূর হোসেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সকল গোয়েন্দাদের চোখে ধুলা দিয়ে পাড়ি জমান ভারতে। শেষ রক্ষা হয়নি, সেখানে গ্রেফতার হতে হয় তাঁকে। এদিকে ঘটনার প্রায় এক বছর পর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক মামুনুর রশিদ মন্ডল নারায়ণগঞ্জের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিমের আদালতে একটি মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযোগপত্রে মোট ৩৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। যার মধ্যে র‍্যাবের সদস্য ছিলেন ২৫ জন। অভিযুক্ত ৩৫ জনের মধ্যে র‍্যাবের তিন কর্মকর্তাসহ ২২ জন কারাগারে ছিলেন। ২২ জনই ঘটনার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। তবে মামলার এজাহারভুক্ত পাঁচ আসামিকে অভিযোগপত্র থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তারা হলেন প্রধান আসামি নূর হোসেনের সহযোগী সিদ্দিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন মিঞা, হাসমত আলী, আমিনুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন ও ইকবাল হোসেন। এজাহারভুক্ত আসামিদের অভিযোগপত্র থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় বাদী সেলিনা ইসলাম এ বছর ১১ মে আদালতে নারাজি আবেদন করেন। ৮ জুলাই নারায়ণগঞ্জের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিমের আদালত নারাজি আবেদন নাকচ করে পুলিশের দেয়া অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন। এরপর নারাজি আবেদন পুনর্বিবেচনার আবেদন করলে জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিমের আদালত গত ৯ নভেম্বর তা খারিজ করে দেন। পরবর্তী সময়ে বাদী সেলিনা ইসলাম বিচারিক আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে ২৩ নভেম্বর হাইকোর্টে ফৌজদারি রিভিশন আবেদন করেন।

প্রয়োজনীয় পেপারবুক প্রস্তুত না হওয়ায় মামলাটির বিচারিক কার্যক্রম প্রায় এক বছর বন্ধ থাকে। পেপারবুক হলো মামলার এজাহার, অভিযোগপত্র, জব্দ তালিকা, জবানবন্দি, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন, জেরা ও নিম্ন আদলতের রায়ের সংকলন। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পেপারবুক তৈরির যাবতীয় কার্যক্রম শেষ হয়। নিম্ন আদালত থেকে কোনো মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়া হলে তা ডেথ রেফারেন্সের শুনানির জন্য হাইকোর্টে আসে। কিন্তু মামলার সংখ্যাধিক্যের কারণে হাইকোর্টে মামলার ডেথ রেফারেন্সের শুনানি শেষ হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। তা ছাড়া বর্তমানে হাইকোর্টে ২০০৯ ও ২০১০ সালের ডেথ রেফারেন্সের মামলাগুলোর শুনানি কার্যক্রম চলছে। তাই সিরিয়াল অনুযায়ী এ মামলার ডেথ রেফারেন্সের শুনানি শুরু হতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। সে কারণেই গত ৫ জানুয়ারি, ২০১৫ পিলখানা হত্যা মামলার আপিল ও ডেথ রেফারেন্স শুনানির জন্য বিচারপতি মো. শওকত হোসেন, মো. আবু জাফর সিদ্দিকী ও মোস্তফা জামান ইসলামের সমন্বয়ে হাইকোর্টে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয়। ওই দিন মামলাটি শুনানির জন্য কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সকল পেপারবুক ও নিম্ন আদালতের রেকর্ড আদালতে না থাকায় আদালত ১৮ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন। শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহাবুবে আলম পেপারবুক পাঠের মধ্যে দিয়ে পুনরায় পিলখানা হত্যা মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তী নয় মাস রাষ্ট্রপক্ষ আদালতে ৩৬ খণ্ডে মোট ৩৫ হাজার পৃষ্ঠার পেপারবুক উপস্থাপন করে, যা শেষ হয় এই বছরের ১ নভেম্বর। রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক পেপারবুক উপস্থাপন সম্পন্ন হলে আদালত ডেথ রেফারেন্সের সমর্থনে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপনের তারিখ ধার্য করেন। যা গত ২৯ নভেম্বর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৫১তম আসামির ডেথ রেফারেন্সের সমর্থনে যুক্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। আইন অনুযায়ী নিম্ন আদালত প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের রায় ডেথ রেফারেন্স মামলা হিসেবে উচ্চ আদালতে আসে। এমনকি দণ্ডিত আসামি আপিল না করলেও মামলা হাইকোর্টে আসে ও মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। সে ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তি হাইকোর্টে রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল না করলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে যায়। তবে এই মামলায় ইতিমধ্যেই দণ্ডপ্রাপ্ত ৫৬৭ আসামি ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মোট ২৫৫টি আপিল আবেদন করেছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষও নিম্ন আদালতের দেয়া ৬৯ আসামির খালাসের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। বর্তমানে আসামিপক্ষ তাদের দায়ের করা আপিলের সমর্থনে ও ডেথ রেফারেন্সের বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করছে। যার শুরুতেই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বিডিআরের সাবেক ডিএডি সৈয়দ তৌহিদুল আলমের পক্ষে যুক্তি প্রদান করা হয়। সকল আসামির পক্ষে যুক্তি প্রদান শেষ হলে রাষ্ট্রপক্ষ পুনরায় এর বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে আসামিপক্ষের আইনজীবী আমিনুল ইসলাম একটি জাতীয় দৈনিককে বলেন, 'যেহেতু প্রত্যেক আসামির পক্ষে পৃথক পৃথকভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হবে, সে ক্ষেত্রে যুক্তিতর্ক শুনানি পর্ব ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ নাগাদ সম্পন্ন হবে।' নিয়মানুসারে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন ও শুনানি পর্ব শেষে হাইকোর্ট এই মামলার চূড়ান্ত রায় প্রদান করবেন। যে রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আপিল আবদেন করতে পারবে ■

তথ্যসূত্র

১. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১ জানুয়ারি ২০১৫
২. *ডেইলি স্টার*, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫
৩. বিডি নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম, ৩০ নভেম্বর ২০১৫
৪. মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১০, আসক

দীর্ঘ দেড় বছর পর বিভিন্ন আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ১২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে সরকার নূর হোসেনকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নূর হোসেনের বিরুদ্ধে ১৩টি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। পরদিন (১৩ নভেম্বর) নূর হোসেনকে আদালতে প্রেরণ করা হলে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে নূর হোসেনকে রিমান্ডের আবেদন না করায় নিহত পরিবারের সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নজরুল ইসলামের স্ত্রী সেলিনা ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নূর হোসেন এই মামলার প্রধান আসামি। অথচ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নূর হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই অভিযোগপত্র দিয়েছেন। সেই অভিযোগপত্রটি অসম্পূর্ণ দাবি করে সেলিনা ইসলাম বলেন, 'এই হত্যাকাণ্ডে র‍্যাবকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর কারা কারা এর সঙ্গে জড়িত, কারা পরিকল্পনাকারী, কারা অর্থের জোগানদাতা– এসব এখনো জানা যায়নি। তাই আমরা চাই, নূর হোসেনেকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হোক।' সাত খুনের ঘটনায় একটি মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী সাখাওয়াত হোসেন মনে করেন, নূর হোসেনকে রিমান্ডে নেয়ার সুযোগ ছিল। রাষ্ট্রপক্ষ ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা চাইলে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন।

এদিকে অভিযোগপত্রভুক্ত ১২ আসামিকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। যার মধ্যে র‍্যাবের আটজন সদস্য রয়েছেন। মামলার বাদী সেলিনা ইসলাম বলেন– এখন নূর হোসেনের লোকজন আগের মতোই মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজিসহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। নারায়ণগঞ্জের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী বর্তমানে নূর হোসেন ও তাঁর ক্যাডারদের লালন করছে। এ ছাড়া আমাদের লোকজনকে মারধর, হুমকি-ধমকিসহ মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, 'সাত খুনের ঘটনার পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে আমাকে পুলিশ প্রহরা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এখন আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।'

মহামান্য হাইকোর্টে সেলিনা ইসলামের দায়ের করা ফৌজদারি রিভিশন আবেদনের শুনানি শুরু হয়েছে ২৯ নভেম্বর বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি আমির হেসেনের বেঞ্চে। ১ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন বাদীপক্ষের আইনজীবী বাসেত মজুমদারকে উদ্দেশ্য করে আদালত এক পর্যায়ে বলেন, 'এ মামলার অভিযোগপত্রে ত্রুটি আছে, সময় নিয়ে এ ত্রুটি খুঁজে বের করে আনবেন। এ ছাড়া অভিযোগপত্র দেয়ার পর আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে আপিল বিভাগের রায় আছে কি না, সেটা খুঁজে বের করে আনবেন। দেশের মানুষ এ বিচারের দিকে তাকিয়ে আছে, ফল যা-ই হোক বিচার শুরু করা উচিত।'

এরপর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন আদালত।

হ্যাঁ, ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে দেশের মানুষ। নিহত পরিবারগুলোর স্বজনদের মতো দেশের মানুষও অপরাধীদের সর্ব্বোচ্চ শাস্তি দেখতে চায়। সেই সাথে ভিকটিম পরিবার ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে হবে। ■

তথ্যসূত্র

১৪ ও ১৫ নভেম্বর, ২ ডিসেম্বর ২০১৫, *প্রথম আলো*

আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকর্তৃক নিহত

১ জানুয়ারি-১৫ ডিসেম্বর - ২০১৫

বাহিনী / ধরন	র‍্যাব	পুলিশ	ডিবি পুলিশ	বিজিবি ও র‍্যাব	যৌথবাহিনী	আনসার	বিজিবি	সেনাবাহিনী	মোট
'ক্রসফায়ার' (গ্রেফতারের আগে)	৩১	৪১	৬	০	১	০	০	৬	৮৫
'ক্রসফায়ার' (গ্রেফতারের পরে)	১৩	২৮	৮	১	০	১	০	০	৫১
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতারের আগে)	০	৪	০	০	০	০	১	০	৫
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতারের পরে)	২	৩	১	০	০	০	০	০	৬
আত্মহত্যা (গ্রেফতারের পরে)	০	৩	০	০	০	০	০	০	৩
গুলি (গ্রেফতারের আগে)	০	১৬	০	০	০	০	২	০	১৮
গুলি (গ্রেফতারের পরে)	০	৮	১	০	০	০	০	০	৯
হৃদরোগ (গ্রেফতারের পরে)	১	২	০	০	০	০	০	০	৩
হত্যা (পরিবারের দাবী ট্রেনের নিচে ফেলে)	০	১	০	০	০	০	০	০	১
মোট	**৪৭**	**১০৬**	**১৬**	**১**	**১**	**১**	**৩**	**৬**	**১৮১**

সূত্রঃ প্রথম আলো, সংবাদ, ইত্তেফাক, সমকাল, নয়া দিগন্ত, ডেইলি স্টার, নিউ এইজ, ঢাকা ট্রিবিউন ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।

বিলুপ্ত ছিটমহলের হালচিত্র

এ. কে. এম বুলবুল আহমেদ

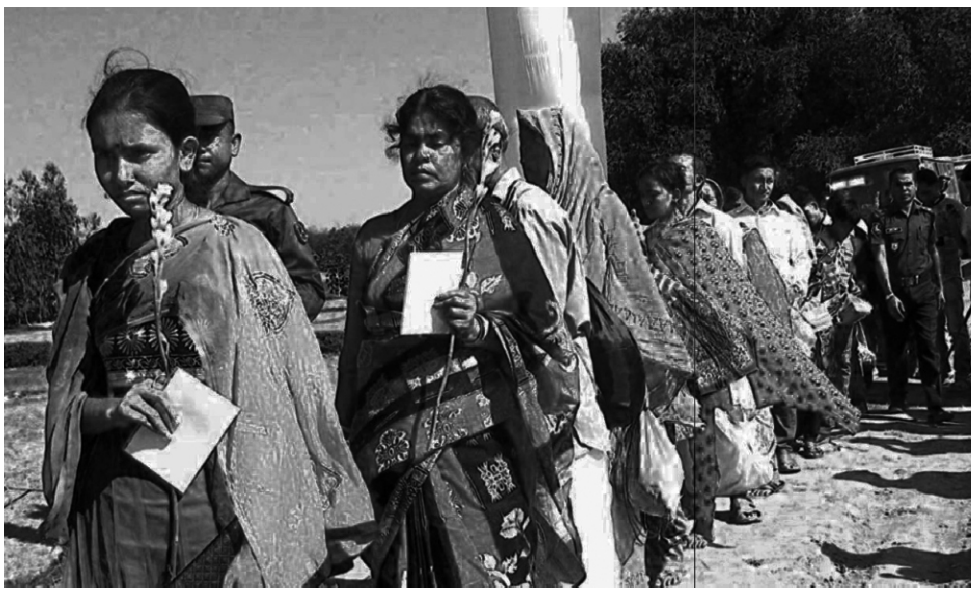

লালমনিরহাট সীমান্ত দিয়ে ভারতের কোচবিহারে প্রথম দফায় চলে যাচ্ছেন বিলুপ্ত ছিটমহলবাসী

এ বছরের ১ আগস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের পরে যাঁরা বাংলাদেশের বিলুপ্ত ছিটমহল থেকে ভারতের নাগরিকত্ব পেতে ইচ্ছুক, তাঁদের প্রথম দলটি ১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ভারত গেছে। বাংলাদেশের লালমনিরহাট সীমান্ত দিয়ে ভারতের কোচবিহারে প্রথম দফায় গেছেন ৬৪ জন। ৬৭ জনের যাবার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনজন জন্মস্থানেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।[১] বাংলাদেশ থেকে ১৯ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ দফায় তিনজন নবজাতকসহ মোট ৯১৭ জন ভারতে গেছেন।[২] মোট ৯৮৭ জন প্রথমে ভারতে যাবার জন্য আবেদন করলেও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে প্রায় ৬৫ জন বাংলাদেশেই থেকে গেলেন। ১৯ নভেম্বর প্রথম দফায় লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা থেকে ৬৪ জন এবং পঞ্চগড় থেকে ৬৭ জন ছিটমহলবাসী প্রতিবেশী দেশ ভারতে পাড়ি জমিয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ৬ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত জনগণনায় পঞ্চগড় জেলার বিলুপ্ত ৩৬ ছিটমহলের ৪৮৭ জন ভারতে যাওয়ার জন্য আবেদন করেন। জনগণনার পর দেবীগঞ্জ উপজেলার কোটভাজনী ছিটমহলে একটি ও দহলা খাগড়াবাড়ী ছিটমহলে তিন শিশুর জন্ম নেওয়ায় এ সংখ্যা ৪৯১-এ দাঁড়ায়। এই ৪৯১ জন ভারতে যাওয়ার কথা থাকলেও বুধবার পর্যন্ত চার দফায় ৪৫০ জন ভারতে গেছেন, এর মধ্যে দুজন নবজাতকও রয়েছে। অবশিষ্ট রয়েছেন ৩৯ জন। এঁদের মধ্যে ৩৪ জনের লালমনিরহাট বুড়িমারী সীমান্ত দিয়ে ৩০ নভেম্বর ভারত যাবার কথা ছিল। তাদের মধ্য থেকে পাঁচজন বাংলাদেশে থেকে যাবার জন্য আবেদন করেছেন।[৩]

দেবীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সফিকুল ইসলাম জানান, চতুর্থ দফায় ২৬ নভেম্বর ২১ পরিবারের ১০৭ জন সদস্যের ভারত গমনের কথা থাকলেও দুই সদস্য তাদের ভারত গমনের সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন। ফলে ২১ পরিবারের ১০৫ জন ভারত গমন করেন। দেবীগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে চারটি বাসে ও চারটি ট্রাকে তাদের মালামালসহ ডোমার উপজেলার চিলাহাটি ডাঙ্গাপাড়াস্থ আবদুর রউফ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে আনা হয়। এখানে ইমিগ্রেশন শেষে দুপুরে কোচবিহার জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আইশা রানীর নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের কাছে তাদের হস্তান্তর করা হয়। তিনি জানান, চতুর্থ দফায় যে সকল পরিবার ও সদস্য ভারত গমনে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁরা রিজার্ভ ডেট হিসেবে বিশেষ সুবিধায় আগামী ৩০ নভেম্বর ভারত গমন করতে পারবেন। নতুন এই ভারতীয়দের বহন করতে ভারতের কোচবিহার প্রশাসন চিলাহাটি-হলদিবাড়ী সীমান্তে নোম্যান্স ল্যান্ডে ১৫০ গজের একটি নতুন রাস্তা তৈরি করেছে। এ ছাড়াও বিএসএফ তাদের সীমানার ভেতরে একটি তোরণ ও মঞ্চ তৈরি করেছে। সীমান্তের ওপারে তাদের অভ্যর্থনা জানান ভারতের কোচবিহার জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আইশা রানী।[৪]

অন্যদিকে কুড়িগ্রামের বিলুপ্ত ছিটমহলগুলো থেকে ভারতের নাগরিকত্ব বেছে নেয়া (ট্রাভেল পাসধারী) ৭৫ জন নাগরিক এখন আর ভারতে যেতে চান না। এ কারণে বৃহস্পতিবার তৃতীয় দফায় তাদের ভারতে যাওয়ার কথা থাকলেও কেউ যাননি। ভূরুঙ্গামারী উপজেলার বাগডাঙ্গর বিজিবি ক্যাম্পের নিকট আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ৯৬২-এর '১ এস'-এর পাশ দিয়ে তাঁদের ভারতে যাওয়ার কথা ছিল। সে মোতাবেক ছিল প্রশাসনের সকল প্রস্তুতি। কিন্তু বিকেল ৫টা পর্যন্ত কেউ আর আসেননি এ সীমান্ত চেকপোস্টে। এর আগে ২৪ নভেম্বর দ্বিতীয় দফায় ৩০টি পরিবারের ১৫৭ জন এবং ২২ নভেম্বর প্রথম দফায় ১৫টি পরিবারের ৭২ জনসহ মোট ২২৯ জন ভারতে যান। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিটমহল দাশিয়ারছড়ার ২০৫ জন এবং ছোট গাড়লঝোড়া'র ২৪ জন নাগরিক। ফুলবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাছির উদ্দিন মাহমুদ জানান, বৃহস্পতিবার সকল আয়োজন থাকলেও কেউ ভারতে যাননি। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী ও ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত ১২টি সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের ১ হাজার ৬৩০টি পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৮ হাজার ১৩২ জন। এর মধ্যে ৭৩ পরিবারের ১৪৭ জন মুসলমান এবং ১৫৮ জন হিন্দুসহ মোট ৩০৫ জন ভারতে যাওয়ার মতামত দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে

১৯ পরিবারের ৭০ জন এখন আর ভারতে যেতে চাচ্ছেন না মর্মে আবেদন করেছেন। এঁদের অধিকাংশই হিন্দু পরিবার। ট্রাভেল পাসধারী বাঁধন ও হাজরা বেগম আগে থেকেই ভারতে অবস্থান করছেন। অন্য তিনজন কোনো প্রকার যোগাযোগ রাখছেন না। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, এঁরা কেউ আর ভারতে যাবেন না। তবে এঁরা ইচ্ছে করলে রিজার্ভ ডেট ২৯ নভেম্বর ভারতে যেতে পারবেন। বিলুপ্ত ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির বাংলাদেশ চ্যাপটার সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা খান জানান, নাড়ির টানে এসব মানুষ বাংলাদেশে থেকে যেতে চান। মূলত বুঝতে না পেরে তারা ভারতে যাওয়ার আবেদন করেন।[৫]

সীমানার ওপারে ভারতগামীদের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া মানুষের জন্য ওপারে নির্মাণ করা হয়েছে কয়েকটি অস্থায়ী আশ্রয়শিবির। এগুলোর প্রত্যেকটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া বা ইটের প্রাচীরে। সেখানেই মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলেছে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া সাবেক ছিটমহলের মানুষজনের। আশপাশের গ্রামগুলোর মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ নেই, চলাফেরাতেও আরোপিত হয়েছে নানা নিষেধাজ্ঞা। পুলিশকে স্মার্টকার্ড দেখিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে তাঁদের। দুদিনেই হাঁফ ধরে গিয়েছে এত দিনের অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির স্বাদ পেতে চাওয়া মানুষগুলোর। তাঁদের মধ্যে ৭২ জন জায়গা পেয়েছেন ভারতীয় সীমান্তের কাছে দিনহাটার কৃষিখামারে। অন্য ৪৮ জনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে হলদিবাড়ীতে। ১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়িতে প্রথম পর্যায়ে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ৬২ জনের।

দিনহাটা কৃষিখামারে তাঁদের থাকার জন্য ৭৫টি টিনের ঘর তৈরি করা হয়েছে। চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটিমাত্র গেট দিয়েই যাতায়াতের সুযোগ রয়েছে বাসিন্দাদের। দিনহাটার অন্য গ্রামের মানুষজনের সাথে মেলামেশার কোনো সুযোগ নেই তাঁদের। নবাগত আবদুল গনি বলেন, 'আগে যেভাবে ছিটমহলে বন্দি ছিলাম, নাগরিকত্বের আশায় ভারতে এসে সেভাবেই বন্দি থাকতে হচ্ছে।'

আরো করুণ অবস্থা হলদিবাড়ীর কৃষিখামারে। বাংলাদেশের বিলুপ্ত ভারতীয় ছিটমহল নাজিরগঞ্জ ও বেউলডাঙা থেকে সেখানে এসেছেন ৪৮ জন। তাঁদের জন্য ৯৮টি ঘর তৈরি করা হয়েছে। তবে শিবিরটি পুরোপুরি ইটের উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বদ্ধ পরিবেশে থাকতে হবে বলে অভিযোগ তুলে নবাগত জয়প্রকাশ রায় বলেন, 'আশপাশের গ্রামগুলির সঙ্গে আমাদের মেলামেশার সুযোগ নেই।' ভোটবাড়ি আশ্রয় শিবিরের বিপুল রায় বলেন, 'বাইরের কারো সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তো নেই, বরং আসা-যাওয়ার সময় পুলিশ হয়রানি করছে।' ছিটমহলবাসীর সংগঠন নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটির নেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বলেন, 'বিষয়টি অমানবিক। অবিলম্বে তাঁদের সাধারণ গ্রামবাসীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে।' মেখলিগঞ্জের ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক (বিধানসভার সদস্য) পরেশ অধিকারী বলেন, 'বন্দিজীবন কাটিয়ে ফের সেই অবস্থায় যাতে পড়তে না হয়, তা প্রশাসনকে সুনিশ্চিত করতে হবে।' এভাবে ঘেরা দিয়ে রাখার বিষয়ে কোচবিহারের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পি উলগানাথন বলেন, 'যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কাছে ভোটার বা আধার (জাতীয়ভাবে প্রদত্ত ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বর) কার্ড নেই। কেউ অপরাধে জড়িয়ে অন্য গ্রামে মিশে গেলে সমস্যায় পড়বে প্রশাসন। এ ছাড়া ওঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে এভাবে থাকার জায়গাগুলি ঘিরে রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে নেটগুলিকে খুলে দেওয়া হতে পারে।[৬]

বিলুপ্ত ছিটমহলে ভূমি জরিপ

বিলুপ্ত ছিটমহলসমূহে শুরু হয়েছে ভূমি জরিপের কাজ। গত ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত জরিপের প্রাথমিক ধাপে মাঠপর্যায়ে কলমি নকশা প্রণয়ন ও খসড়া খতিয়ান প্রস্তুতের কাজ চলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে। সে অনুযায়ী জরিপের কাজও চলেছে। তবে অনেকেই অভিযোগ করে বলেছেন, জরিপকারী দলের নিকট সাধারণ ভূমি-মালিকেরা কোনো গুরুত্ব পাচ্ছেন না। তাঁরা প্রাধান্য দিচ্ছেন এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের। এক স্থানে জরিপ শুরু হলে প্রভাবশালীরা তাঁদের সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁদের প্রায় সময় ঘিরে থাকায় গরিব মানুষ যাঁরা সামান্য কিছু জমি নিয়ে এত দিন ছিটে বসবাস করে আসছেন, তারা পাত্তা পাচ্ছেন না। জরিপকারী দল শুধু দখলের ভিত্তিতে জরিপকাজ চালাচ্ছে। আর এই দখলের ভিত্তিতে জরিপকাজ চালানোয় অনেক ভূমি মালিকই তাদের জমি হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা করছেন। কেননা অনেকে জমির দাগ ও পরিমাণ জানেন না, ১৯৪০ সনের সিএস খতিয়ানের ম্যাপ ও দাগকে কেন্দ্র করে জরিপ করলেও মাঠ পর্যায়ে জমির ম্যাপ ও দাগ অনুযায়ী জমি মিলছে না। একাধিক জমি অন্য দাগ ও ম্যাপে মিশে গেছে। কোনো ক্ষেত্রে জমি বন্ধক রেখে স্ট্যাম্পে লিখে দিয়ে ভোগ দখল দেয়ায় আবার ওই জমির মালিকানা দাবি করছে উভয় ব্যক্তি। এসকল বিষয় নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়ায় প্রতিদিন ৪০ একর জমি জরিপ করার লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হলেও কাজ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে হিমশিম খেতে হচ্ছে জরিপকারীদের। ফলে জরিপ সম্পন্ন করতে বিলম্ব হচ্ছে। বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি বিনিময়ের মাত্র মাস তিনেকের মধ্যেই ভূমির মালিকানা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভূমির দখলি স্বত্বের ওপর ভিত্তি করে জমির মালিকানা নির্ধারণ করা হচ্ছে। কিন্তু অনেকেই পৈর্তৃক সূত্রে পাওয়া জমির মালিকানা দাবি করছেন। নকশা আর রেকর্ডপত্র না থাকায় সমস্যার নিষ্পত্তিতে হিমশিম খাচ্ছে জরিপ দল। তারা জরিপের সময় বাড়ানোরও আবেদন করেছেন।[৭] ■

তথ্যসূত্র

১. বাংলানিউজ, ১৯ নভেম্বর ২০১৫ এবং মানবকণ্ঠ, ২০ নভেম্বর ২০১৫
২. প্রথম আলো, ১ ডিসেম্বর ২০১৫
৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ নভেম্বর ২০১৫
৪. দৈনিক মানবজমিন, ২৭ নভেম্বর ২০১৫
৫. সংবাদ, ২৭ নভেম্বর ২০১৫
৬. ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টাইমস্ গ্রুপের 'এই সময়' পত্রিকার ২৩ নভেম্বর ২০১৫-এর প্রতিবেদন
৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ অক্টোবর ২০১৫

অং সান সুচির সামনে বন্ধুর পথ

আহমেদ সাঈদ

আমাদের পাশের দেশ মিয়ানমারে (বার্মা) এক 'নবযাত্রার' সূচনা হয়েছে। সরকারি নাম মিয়ানমার হলেও অনেকেই এখনো দেশটিকে বার্মা নামে ডাকতেই বেশি পছন্দ করেন।

১৯৪৮ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে বার্মা। স্বাধীনতা লাভের মাত্র এক বছর আগে স্বাধীনতার অন্যতম রূপকার অং সান সুচির পিতা অং সান গুপ্তহত্যার শিকার হন। এরপর ১৯৬২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করে সেনাপ্রধানের নেতৃত্বাধীন রেভল্যুশনারি কাউন্সিল। ১৯৭৪ সালে গৃহীত হয় সংবিধান। আর সেই থেকে জেনারেলদের নেতৃত্বাধীন বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টির (বিএসপিপি) একদলীয় শাসন চলতে থাকে। এই একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল। কিন্তু সব সময় তা কঠোরভাবে দমন করা হয়। সেনাবাহিনীর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালে এক উত্তাল গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। চরমভাবে দমন করা হয় সেই গণ-আন্দোলন। হত্যা করা হয় ১০ হাজারেরও বেশি প্রতিবাদকারীকে। আবারও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরাসরি ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী, জারি করা হয় সামরিক আইন। ১৯৮৯ সালে সেনাবাহিনী দেশটির নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার বলে ঘোষণা দেয়।

এরপর ১৯৯০ সালের মে মাসে প্রায় ৩০ বছর পর অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) ওই নির্বাচনে ৮০ শতাংশ আসনে (৪৯২টির মধ্যে ৩৯২টি) জয়যুক্ত হয়। কিন্তু সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়, সুচিকে গৃহবন্দি করা হয় এবং এনএলডিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

এরপরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে। ব্যাপক কারচুপির সেই নির্বাচনের মাধ্যমে সেনাবাহিনী-সমর্থিত ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিকে (ইউএসডিপি) জয়ী ঘোষণা করা হয়। অং সান সুচির এনএলডি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

২০১০ সালের নির্বাচনের পর থেকে সাবেক সেনাপ্রধান থেইন সেইনের সরকার বেশ কিছু সংস্কার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০১১ সালে অং সান সুচিকে গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়। একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, দুই শতাধিক রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেয়া হয়। এনএলডির নির্বাচনে অংশগ্রহণের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় এবং ২০১২ সালে ইউএসডিপির ছেড়ে দেয়া ৪৫টি আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে এনএলডি ৪৩টি আসনে জয়লাভ করে। অং সান সুচি বিরোধীদলীয় নেত্রী হন।

বর্তমান নির্বাচনে এনএলডি একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই এনএলডি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। উচ্চকক্ষ হাউস অব ন্যাশনালিটিজ-এর ২২৪টি আসনের মধ্যে ১৬৮টিতে নির্বাচন হয়েছে (৫৬টি সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত)। এর মধ্যে এনএলডি পেয়েছে ১৩৫টি। সেনা-সমর্থিত ইউএসডিপি পেয়েছে ১১টি আসন।

অন্যদিকে নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর ৪৪০টি আসনের মধ্যে নির্বাচন হয়েছে ৩৩০টি আসনে (১১০টি সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত)। এর মধ্যে এনএলডি পেয়েছে ২৫৫টি, আর ইউএসডিপি পেয়েছে ৩০টি আসন।

তবে এই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও অং সান সুচি দেশটির পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। কারণ সুচিকে ঠেকানোর জন্যই বর্তমান সংবিধানে বিধান রাখা হয়েছে যে, স্বামী/স্ত্রী বা সন্তান বিদেশি হলে তিনি প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। সংবিধান সংশোধনের জন্য তিন-চতুর্থাংশ পার্লামেন্টারিয়ানের সমর্থন দরকার, তাই সেনাবাহিনীর সরাসরি সমর্থন ছাড়া সংবিধান পরিবর্তন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

শুধু সংবিধান পরিবর্তনই নয়, দেশ পরিচালনার প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই সুচিকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আপোষ করে চলতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ তিন মন্ত্রণালয়ের (প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও সীমান্তরক্ষা) মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা সেনাপ্রধানের হাতে।

এ পরিস্থিতিতে সুচি তাঁর দলের কাউকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত করবেন। কিন্তু তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়াটাও সহজ হবে না। কারণ নিয়ম হলো– উচ্চকক্ষ একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ঠিক করবে, নিম্নকক্ষ ঠিক করবে একজন আর সেনাবাহিনী মনোনীত করবে একজনকে। এরপর দুই কক্ষের যৌথ সেশনে ভোটাভুটিতে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন তিনি হবেন প্রেসিডেন্ট, আর অন্য দুজন হবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট।

এটি এখন নিশ্চিত যে, সুচিই আগামী দিনে বার্মার নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন। অধিকাংশেরই ধারণা, তাঁর নেতৃত্বে বার্মায় এক নতুন যুগের সূচনা হবে। তবে কিছু আশঙ্কার দিকও রয়েছে। যেমন–

দেশটির রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘন, যাকে অনেকেই 'গণহত্যার' সঙ্গে তুলনা করেছেন, সে ব্যাপারে সুচি কখনোই সোচ্চার হননি। এমনকি নির্বাচনী কৌশল হিসেবে কোনো মুসলমানকে তার দল থেকে প্রার্থীও করেননি। সেনাবাহিনীর সঙ্গে আগামী দিনে তাঁর দলের সম্পর্ক কেমন থাকবে, তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। সর্বোপরি আরেকটি উৎকণ্ঠার বিষয় হচ্ছে– নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই সুচি ঘোষণা দেন যে, তাঁর দলের অন্য কেউ প্রেসিডেন্ট হলেও তাঁর অবস্থান থাকবে প্রেসিডেন্টের ওপরে। এদিকে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের স্থানই সবার ওপরে।

২৮ নভেম্বর দলের নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে সুচি কঠোর ভাষায় বলেছেন– দলীয় প্রধান হিসেবে তাঁর কাছ থেকে আসা সিদ্ধান্তই দলের সিদ্ধান্ত। দলের ঐক্য বিনষ্টের কোনো চেষ্টা বরদাশত করা হবে না। দলের ভেতর কেউ উপদল তৈরির চেষ্টা করলে তাঁকে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে এবং জনগণের সঙ্গে কোনো রকম বেইমানি সহ্য করা হবে না।

বার্মার সেনাবাহিনীর অতীত ইতিহাস বিবেচনায় এবং তাদের কূটচাল মাথায় রেখে সুচির এ ধরনের কঠোর অবস্থান যৌক্তিক বলে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অনেকের আশঙ্কা– নিজেকে সবার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে 'গণতন্ত্রের মানসকন্যার' মাথায় না আবার একনায়কতন্ত্রের ভূত চেপে বসে!

আরো একটি আশঙ্কা রয়েছে– সংবিধান অনুযায়ী সেনাপ্রধানের নেতৃত্বাধীন 'ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি কাউন্সিল' যে-কোনো সময় জরুরি অবস্থা জারি করে সরকারের সকল ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারে। দুটি অবস্থাকে ব্যবহার করে তারা এ ধরনের অপপ্রয়াস চালাতে পারে– প্রথমত, জাতিগত বিদ্রোহী দলগুলোর সঙ্গে একটি শান্তি প্রক্রিয়া চলছে। এর অংশ হিসেবে বেশ কিছু বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে অস্ত্রবিরতি ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু কিছু গোষ্ঠী এখনো এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সেসব এলাকায় সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে তাদের অভিযান জোরদার করেছে। এই পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করার মাধ্যমে সেনাবাহিনী একটা সুযোগ নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্টকে সামনে রেখে সুচির দেশ পরিচালনার চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের বরখেলাপ করা হচ্ছে এবং বেসামরিক সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ– এমন অভিযোগ তুলে তারা ক্ষমতা দখলের সুযোগ নিতে পারে, যেমনটা তারা করেছিল ১৯৬২ সালে।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে নতুন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের কথা আগামী বছরের (২০১৬) এপ্রিলে। তাই দেশটির জন্য আগামী কয়েক মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচনে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনকে গত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে অং সান সুচির বিশাল বিজয়কে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হচ্ছে। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে– এই নির্বাচনের মাধ্যমে যে ৪৯৮ জন পার্লামেন্টারিয়ান সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজনও মুসলমান নেই। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী ৬ হাজার ৭৪ জন প্রার্থী এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে মুসলিম প্রার্থী ছিলেন মাত্র ২৮ জন। শতাংশের হিসেবে এটি মাত্র ০.৫ শতাংশ, অথচ দেশটির মুসলিম জনগোষ্ঠী ৫ শতাংশ।

আরো হতাশার ব্যাপার হচ্ছে, অং সান সুচির এনএলডিসহ কোনো বড় দলই কোনো মুসলমানকে প্রার্থী করেনি। যে ২৮ জন মুসলিম প্রার্থী ছিলেন, তাঁদের সবাই ছোট ছোট কিছু দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এই ২৮ জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৮ জন প্রার্থী ছিলেন ডেমোক্রেসি অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস পার্টি থেকে। অবশ্য এই পার্টির চেয়ারম্যান জ মিনের প্রার্থিতা নির্বাচন কমিশন বাতিল করেছে এই বলে যে, তাঁর পিতা-মাতা দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত নন। অথচ জ মিন ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এনএলডি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতেছিলেন। অবশ্য তখন এনএলডিকে ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

২০১০ সালের নির্বাচন সারা বিশ্বে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অং সান সুচির এনএলডি সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। সেনাবাহিনী-সমর্থিত ইউএসডিপি অধিকাংশ আসনে জয়যুক্ত হয়। সেই নির্বাচনে তিনজন মুসলিম পার্লামেন্টারিয়ান নির্বাচিত হন। তাঁদের একজন স্যু মং। তিনি এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। যাঁরা এর আগের নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন অথবা এই নির্বাচনের আগ পর্যন্তও একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিলেন, তাঁরা এবারের নির্বাচনে অংশ নিতে পারলেন না; কারণ রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাময়িক জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে একটি 'হোয়াইট কার্ড' দেয়া হয়েছিল, যা দিয়ে তারা ২০১০ সালের নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু এবারের নির্বাচনের আগে ওই 'হোয়াইট কার্ড'কে বাতিল ঘোষণা করা হয়।

দেশের ৭ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলমানকে ২০১০ সালের নির্বাচনের আগে 'হোয়াইট কার্ড' দেয়া হয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকার হঠাৎ করেই ঘোষণা দেয় যে, ৩১ মার্চের মধ্যে সবাইকে 'হোয়াইট কার্ড' ফেরত দিতে হবে এবং ১ জুন পর্যন্ত তাদের নাগরিকত্ব আইন, ১৯৮২ অনুযায়ী নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে। বলা হয় যে, নাগরিকত্ব লাভের জন্য তাদের প্রমাণ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে যে, তাঁদের বংশধরগণ দীর্ঘদিন বার্মায় বসবাস করছেন।

লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে– ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনে যে সকল 'জাতিগত' পরিচয়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তার মধ্যে 'রোহিঙ্গা' নেই। সুতরাং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এক শাঁখের করাতের মুখোমুখি হয় এবং তারা 'হোয়াইট কার্ড' ফেরত দিয়ে যদি কর্তৃপক্ষকে তাদের পূর্বপুরুষের বার্মায় বসবাস প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে তারা 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত হবে। এই দ্বন্দ্বের কারণে অনেকেই তখন 'হোয়াইট কার্ড' ফেরত দেননি। সরকারি হিসাবমতে, তাঁরা ৪ লাখের মতো 'হোয়াইট কার্ড' সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। ■

আইএস যখন বুমেরাং

মিজান মল্লিক

ফ্রান্সের প্যারিসে ১৩ নভেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পর সারা বিশ্ব নতুন করে কট্টরপন্থি ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে। প্যারিসের ছয়টি স্থানে নৃশংস এই হামলায় ১২৯ জন নিহত হয়েছেন। এর বদলা নিতে সিরিয়ায় আইএসের ঘাঁটিতে মুহুর্মুহু বিমান হামলা চালিয়েছে ফ্রান্স। অবশ্য ফরাসি যুদ্ধবিমান থেকে ছোড়া বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র ফাঁকা জায়গায় পড়েছে, দাবি করে উপহাস করেছে আইএস।

প্যারিসে নিহত ব্যক্তিদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে আইএসের উত্থানের প্রেক্ষাপট নিয়েও তুমুল বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে।

প্যারিসে হামলার পরদিন মার্কিন ডেমোক্র্যাট বিতর্ক হয়। শুরুতেই আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন প্রত্যাশী তিন প্রার্থীর কাছে প্যারিস হামলার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়। বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যান বার্নি স্যান্ডার্স। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ নয়, জলবায়ু পরিবর্তনই যুক্তরাষ্ট্রের সামনে প্রধান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ।

তবে বার্নি স্যান্ডার্স পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 'এই আইএসের উত্থানের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের হাত রয়েছে। ইরাকে আগ্রাসী যুদ্ধের ফলেই আল-কায়েদা ও আইএসের উত্থান ঘটে। এর দায়দায়িত্ব আমরা চাইলেও এড়াতে পারব না।'

এখানে বলে রাখা দোষের হবে না যে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সৌদি আরব, তুরস্ক, কাতার ও উপসাগরীয় বাদশারা নিকট-অতীতে আল-কায়েদা এবং সম্প্রতি আইএসকে প্রশিক্ষণ, অর্থ, অস্ত্র ও লোকবল দিয়ে সহযোগিতা করেছে। বেশ কয়েকজন মার্কিন সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সমালোচক আইএস সৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের হাত থাকার দাবি করে আসছিলেন। এবার তা উচ্চারিত হলো ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীর মুখ থেকেই, আইওয়ায় ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টির এই দ্বিতীয় বিতর্ক চলাকালে।

বিতর্কে আরেক প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। এ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। তিনি এ-ও বলেন, আইএসকে শুধু প্রতিরোধ করলেই চলবে না। পরাজিতও করতে হবে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলে তিনি আরো বলেন, 'যারা সরাসরি আইএসের বিরুদ্ধে লড়ছে, আমরা তাদের সহায়কের ভূমিকা পালন করব।'

তবে প্রেসিডেন্ট পদের মনোনয়ন প্রত্যাশী আরেক প্রার্থী ও'ম্যালি বলেন, 'এই যুদ্ধ নিতান্তই যুক্তরাষ্ট্রের। ওয়াশিংটনের শ্রেষ্ঠত্ব তখনই প্রকাশিত হয়, যখন সে অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়।'

নেতৃত্ব না দিলেও, আফগানিস্তানে ১৯৭৯ সালে দখলদার রুশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আল-কায়েদা ও তালিবান জঙ্গিদের সরাসরি সহযোগিতা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। আফগানিস্তান ছাড়াও বসনিয়া, কসোভো, লিবিয়া, সিরিয়া ও ককেসাস অঞ্চলের কট্টর ইসলামপন্থিদের সহযোগিতা দিয়েছে। আফগানিস্তান, ইরাক ও লিবিয়ার সেক্যুলার শাসকদের উৎখাত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে এখন চাইছে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে। আইএসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্কের কুর্দি যোদ্ধারা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং ন্যাটোর সদস্য তুরস্ক এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে।

রাশিয়া, ইরান, ইরাক ও লেবানন সিরিয়ার আসাদ-সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছে। সিরিয়ার সরকার আইএসসহ বিরোধী একাধিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এ নিয়ে দেশ চারটি ওয়াশিংটনের কড়া সমালোচনা করে আসছে।

এ কথা ঠিক যে, যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় আইএসকে লক্ষ্য করে কয়েক মাস ধরে বিমান হামলা চালিয়ে আসছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সিরিয়ার অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তেল উত্তোলনের ক্ষমতা নষ্ট করে দিতে চাইছে। এদিকে অতি সম্প্রতি সিরিয়ায় আইএস ধ্বংসের নামে রাশিয়াও বিমান হামলা শুরু করেছে। তারাও কৌশলে আসাদের অন্য শত্রুদেরও ঘায়েলের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মূলধারার গণমাধ্যমে আরেকটি বিষয় প্রায় আসেই না, তা হলো কাতারের প্রস্তাবিত প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইন, যেটি সিরিয়ার ওপর দিয়ে যাবে ইউরোপে। সিরিয়ায় গণ-আন্দোলন শুরুর পরে

তা গৃহযুদ্ধে পরিণত হওয়ায় ওই লাইন নির্মাণ বন্ধ রয়েছে। এই পাইপলাইন-সংযোগ সম্পন্ন হলে ইউরোপে রাশিয়ার জ্বালানি তেলের একচেটিয়া আধিপত্যে কিছুটা ভাটা পড়বে। সে হিসাবও এখানে কষা হচ্ছে।

২০১১ সালে লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফিবিরোধী যুদ্ধ চলাকালে আল-কায়েদার ঘনিষ্ঠ জঙ্গিদের ন্যাটো 'নো ফ্লাই জোনস' অঞ্চল ঘোষণা করে সুরক্ষা দেয়। আর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদবিরোধী আন্দোলন উসকে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। বিরোধীদের এখনো প্রকাশ্যেই মদদ দিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। ওবামাও স্পষ্ট করে বলে আসছেন, চলমান এই সংকট মোচনে আসাদকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতেই হবে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এমনটি চায় কেন? এর পক্ষে বলা হয়, আসাদ একজন স্বৈরাচারী। অথচ রূঢ় বাস্তবতা হলো, বিশ শতকের মধ্য থেকে একুশ শতকে এমন কোনো স্বৈরাচারীর নাম নেওয়া প্রায় সম্ভব হবে না, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ছিলেন না। যুক্তরাষ্ট্র শুধু সমর্থন দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সেসব দেশের জনগণের ইচ্ছা ও অধিকারকে পায়ে পিষে স্বৈরাচারী শাসকদের জোর করে ক্ষমতায় বসিয়েছে, টিকে থাকতে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়েছে। বর্তমানে এই তালিকায় রয়েছে সৌদি আরব, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, কলম্বিয়া, কাতার ও ইসরায়েল।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এমন সাপে-নেউলে সম্পর্কের কারণ কী? যে কারণে কিউবার সঙ্গে ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে শত্রুতা অব্যাহত রেখেছিল ওয়াশিংটন, ভেনেজুয়েলার সঙ্গে চলে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে, এর আগে ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, উরুগুয়ে, চিলির সঙ্গে শত্রুতা ছিল যে কারণে। এসব দেশের নেতাদের মধ্যে সাযুজ্য কী ছিল, তা এক শব্দে বলতে গেলে বলতে হয়, স্বাধীনতা। হ্যাঁ, মার্কিন আধিপত্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির জাঁতাকল থেকে নিজ নিজ দেশকে স্বাধীন রাখতে নেতাদের দৃঢ় প্রত্যয়ই ছিল ঘোর শত্রুতার প্রধান কারণ। সিরীয় প্রেসিডেন্ট আসাদের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠতাও আরেক কারণ। শত্রুর বন্ধুও শত্রু, এই হলো মার্কিন হিসাব। আর ঠিক এই কারণেই আসাদকে হঠাতে আইএস সহ অন্য বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে মদদ দেয় যুক্তরাষ্ট্র। তাদের মদদপুষ্ট গোষ্ঠীই এখন হামলা চালিয়েছে প্যারিসে। সেখানে একটি পানশালা, রেস্তোরাঁ, কনসার্ট হল ও খেলার মাঠে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএস।

এই হামলাকে 'হৃদয়বিদারক' উল্লেখ করে বারাক ওবামা বলেন, 'এই হামলা শুধু প্যারিসের ওপরই চালানো হয়নি, এ নয় শুধু ফরাসি জনগণের ওপর আক্রমণ, বরং এ হলো সমগ্র মানবতা এবং আমরা যে শাশ্বত মূল্যবোধে বিশ্বাস করি, এর ওপর আঘাত হানা।'

এ রক্তপাত নিঃসন্দেহে হৃদয়বিদারক। কিন্তু ওবামার উল্লেখ করা 'সমগ্র মানবতা' এবং শাশ্বত মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ প্যারিস হামলার আগের দিন লেবাননের বৈরুতে সন্ত্রাসী হামলায় ৪০ জনের বেশি নিহত হন। ওবামা তখন টুঁ শব্দটিও করেননি। এ ছাড়া মার্কিন ড্রোন হামলায় আফগানিস্তান, পাকিস্তান, লেবানন ও অন্যান্য স্থানে শিশুসহ নিরস্ত্র মানুষ নিহত হন, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের হৃদয় কেন ভেঙে খান খান হয় না? বৈরুতে হামলায় হতাহতের ঘটনা নিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো অপেক্ষাকৃত কম সরব ছিল।

এই প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ লেখক ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক জনাথন কুক 'আউটরেজ অ্যাট প্যারিস অ্যাকটস মাসকস আওয়ার রেসিজম' শিরোনামে এক লেখায় বলছেন, পশ্চিমারা এই মুহূর্তে যা অনুভব করছে, তা হলো একেবারে নির্বাচিত চরম সন্ত্রাসী হামলার কথা। যার শিকার হয়েছেন 'আমাদের মতো' লোকজন। প্যারিসে নিহত মানুষদের স্মরণে আমরা আর্তনাদ করছি। অথচ আগের দিন একই গোষ্ঠীর হামলায় লেবাননে নিহত মানুষদের কথা আমরা আমলেই নিইনি।' এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ সম্পর্কে কুক বলছেন, 'ইউরোপীয় হিসেবে সব সময় এই ধারণা পোষণ করে এসেছি যে, আমরাই পরিপূর্ণ মানুষ, মধ্যপ্রাচ্য কিংবা পৃথিবীর অন্য অংশের লোকজন যেন কিছুটা অসম্পূর্ণ মানুষ। তাঁরা আমাদের সমবেদনা পাওয়ার উপযুক্ত নন। এই চিন্তা থেকেই ইউরোপ উপনিবেশবাদী হয়েছে, বাদামি বর্ণের মানুষদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ঐতিহাসিক বর্ণবাদী হিসেবে, এখন ইউরোপীয়দের স্বীকার করার সময় এসেছে যে, পশ্চিমা উপনিবেশবাদ অতীতের ঘটনা নয়, এখনো তা বহাল তবিয়তে আছে। এখনো আমাদের হৃদয়ের গভীর রয়ে গেছে বর্ণবাদ। আমরা এখনো বাদামি বর্ণের মানুষদের সভ্য করার তালে আছি। এখনো মনে করি, তাঁদের গড়েপিটে মানুষ করার মহান দায়িত্ব আমাদের কাঁধে। এজন্য আমাদের ইচ্ছেমাফিক তাঁদের বাঁকাই। জোর করে তাঁদের উন্নত করতে চাই। তাঁদের সামনে বক্তৃতাবাজি করতে চাই। তাঁদের ভর্ৎসনা করি, হুমকি দিই, তাঁদের নির্বাচনের ফল পাল্টে দিই, তাঁদের অত্যাচারী শাসকদের হাত আরো শক্ত করার জন্য অস্ত্র সরবরাহ করি, তাঁদের সম্পদ নষ্ট করি।'

এ তো গেল ব্রিটিশ এক লেখকের কথা। আর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি আইএসকে 'মানসিক বিকারগ্রস্ত এক দানব' বলে ক্ষোভ ঝেরেছেন। তিনি এও বলেন, এই দানবকে নাশ করতে ফ্রান্সের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে তাঁর দেশ।

এদিকে ফ্রান্সের জনগণকে ইঙ্গিত করে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেন, 'তোমাদের মূল্যবোধ, আমাদেরও, তোমাদের ব্যথায় আমরাও সমব্যথী, তোমাদের লড়াইও আমাদের, আমরা যূথবদ্ধ হয়ে এই সন্ত্রাসীদের পরাজিত করব।'

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অন্য দেশেও হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছে আইএস। নিজেদের হাতে গড়া 'দানব' এখন বুমেরাং হয়ে উঠেছে। কোত্থেকে এল ক্যামেরনের কথিত এই 'দানব', চায়ই বা কী?

আইএসের লক্ষ্য স্থির। 'খিলাফত' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি শরিয়া মোতাবেক তা পরিচালনা করা। এই লক্ষ্যেই ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা থেকে বেরিয়ে আসে জঙ্গিগোষ্ঠীটি। আইএস গত বছরের ১০ জুন ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মসুল দখল করে। তখন সিরিয়ারও বেশ কয়েকটি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নেয় তাদের যোদ্ধারা। এরপর ২৯ জুন ইরাকে 'খিলাফত'

প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এর নেতা আবু বকর আল-বাগদাদি নিজেকে তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলের 'খলিফা' হিসেবে ঘোষণা করেন।

তাঁর সেই 'খিলাফত' রাষ্ট্রে হামলার প্রতিবাদ করা হয় শিরশ্ছেদ করে। তাঁর খিলাফত রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করতে এবং এর পরিধি আরো বিস্তৃত করতে সারা বিশ্বের জিহাদিদের ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান।

এরপর অনলাইনে তাঁর ওই ভিডিও ছাড়া হয়। এর মধ্য দিয়ে জিহাদিদের উদ্বুদ্ধ করতে প্ররোচনা জোগানো হয়। কাজেও দেয়। সারা বিশ্বের আনাচ-কানাচ থেকে দলে দলে জিহাদি যোগ দেন। অনেকে আবার কিছু দিন লড়াই করে নিজ নিজ দেশে ফিরে যান। ইসলামি শরিয়া আইন অনুযায়ী শাসন চলে এই রাষ্ট্রে।

কট্টরপন্থি ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর মহড়া

কথিত সেই খিলাফত রাষ্ট্র থেকেই এখন প্যারিসে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে দাবি ফরাসি কর্তৃপক্ষের। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপের অন্য দেশে হামলার হুমকি দিয়েছে আইএস। এর পরও ওবামা বলেছেন, সিরিয়ার মাটিতে কোনো বাহিনী পাঠাবে না যুক্তরাষ্ট্র। এতে কী পরিষ্কার হয়? আইএসের উত্থান ঠেকাতে দেশটির কি আদৌ কোনো পরিকল্পনা আছে? বিরোধী রিপাবলিকানরা বলে আসছেন, আইএস দমনে ওবামা প্রশাসনের কোনো সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশল নেই। একই ধরনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, হোয়াইট হাউসের সাবেক উপদেষ্টা স্টিভ স্মিডথের কথায়। তিনি বলেন, আইএসের উত্থান ঠেকানো ও জঙ্গিবাদ দমনের কৌশল নিয়ে পরিষ্কার কোনো পরিকল্পনা নেই। তিনি আরো বলেন, প্রশাসনে বা রাজনৈতিক বিতর্কের মঞ্চে এমন একজন লোকও নেই, যিনি বলতে পারবেন, এখন কী করা উচিত। তিনি এ-ও বলেন, রিপাবলিকান দলের কাছেও এ নিয়ে কোনো পরিকল্পনা বা কৌশল নেই। তাহলে কীভাবে পরাজিত হবে আইএস?

এই তো কয়েক বছর আগেও আল-কায়েদাকে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি বলে প্রচার করা হতো। মার্কিন বিশেষ কমান্ডো বাহিনীর হাতে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ওসামা বিন লাদেন নিহত হওয়ার কয়েক বছর যেতে-না-যেতেই অস্তিত্বসংকটে পড়েছে। এরই মধ্যে উত্থান ঘটেছে আইএসের। আল-কায়েদার সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য হলো, আল-কায়েদা নির্দিষ্ট কোনো ভূমি দখলে রাখতে চায়নি। বিশ্বের নানা দেশে ছোট ছোট স্বায়ত্তশাসিত গোষ্ঠী হিসেবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত। আফগানিস্তানসহ যখন যে এলাকায় জিহাদের প্রয়োজন পড়ত, সেখানে জড়ো হতো। কিন্তু আইএস একটি নির্দিষ্ট এলাকা দখল করে নিয়েছে। ক্রমে এর বিস্তার ঘটাতে চাইছে। আইএস কি একটি সংগঠন মাত্র, নাকি আইডিয়া?

গত বছরের ডিসেম্বরে *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস* মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল অপারেশন কমান্ডার মেজর জেনারেল কে নাগাটার গোপন মন্তব্য ফাঁস করে দেয়। এতে দেখা যায়, আইএস সম্পর্কে এই মেজর জেনারেল বলছেন, 'আমরা তাঁদের আইডিয়া বা চিন্তাকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছি।' তিনি আরো যোগ করেন, 'বলতে গেলে, আমরা এমনকি ওদের আইডিয়া কী, তা-ই জানতে পারিনি।'

কোনো সংগঠনকে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু চিন্তাকে নয়। এ কারণেই আইএস বড় ধরনের হুমকি। তাঁদের আইডিয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে, খোদ যুক্তরাষ্ট্রেরই অনেক বাসিন্দা। তাঁরাই হয়ে উঠতে পারে ঘরের শত্রু বিভীষণ। এটাই আইএসের অন্তর্নিহিত শক্তি। এ ছাড়া রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যেমনটি বলছেন, ৪০টি দেশ থেকে আর্থিক সহযোগিতা পায় কট্টর সুন্নি মতাবলম্বী গোষ্ঠীটি। তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় তেলক্ষেত্রগুলো থেকে অবৈধভাবে তেল বিক্রি করেও বিপুল অর্থ আসছে তাদের হাতে। তাদের অর্থের উৎস বন্ধ করতে চান পুতিন। আইএসবিরোধী মহাজোট গঠনের আহ্বান জানিয়েছে ফ্রান্স। হয়তো শিগগিরই তা হবে। আইএসের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে যে হামলা চলছে, তা আরো শত গুণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তাতে কি শেষ রক্ষা হবে? দেশে দেশে সন্ত্রাসী হামলা বন্ধ হবে?

প্যারিস, ওয়াশিংটন কিংবা অন্য অন্য শহরে আইএসের হামলা বন্ধে করণীয় সম্পর্কে ব্রিটিশ লেখক জনাথন কুকের প্রস্তাব ভিন্ন রকমের। তিনি বলছেন, 'আমরা যদি এ ধরনের হামলা বন্ধ করতে চাই, এবং নিজ নিজ সমাজকে অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করতে হবে। অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন, স্বার্থ উদ্ধারে অন্যদের অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। বৈরুতের তুলনায় প্যারিসের ভিকটিমদের নিকটতর ভাবা বন্ধ করতে হবে। আমরা যেমনটি ভাবি, সত্যি যদি তেমন সভ্য হই, তাহলে মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে হবে, তাঁরা সবাই সমানভাবে আমাদের সমবেদনা পাওয়ার দাবি রাখে।' ■

চাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

২০১৩ সালের ১১ নভেম্বর বাংলাদেশের সরকার 'তৃতীয় লিঙ্গ' তথা হিজড়াদের আলাদা একটি লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। নিঃসন্দেহে উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ সংবিধান ঘোষণা করেছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। প্রসঙ্গত, নারী ও পুরুষ কমবেশি অধিকার ভোগ করলেও হিজড়ারা বরাবরই পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে বঞ্চিত, অবহেলিত ও অবাঞ্ছিত হিসেবে অবস্থান করছেন। কোথাও মানুষ হিসেবে তাঁদের মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হয়নি।

বিশ্বের উন্নত দেশে হিজড়াদের অবস্থান ক্ষেত্রবিশেষে ভালো, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মতোই। ২০১১ সালে নেপাল পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আদমশুমারিতে নারী ও পুরুষের বাইরে হিজড়াদেরও গণনার আওতায় আনে। নেপালের পর পাকিস্তান, বাংলাদেশ, জার্মানি এবং গত বছর ভারতেও হিজড়া সম্প্রদায় তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এই অঞ্চল হিজড়াদের অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সম্প্রতি ভারতে একজন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি চেন্নাইয়ের পৃথিকা যশিনি। তামিলনাড়ু ইউনিফর্মড সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (টিএনইউএসআরবি) তাঁকে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসেবে চাকরি দিতে অস্বীকৃতি জানালে পৃথিকা আইনি লড়াইয়ে নামেন। চেন্নাইয়ের উচ্চ আদালত তাঁর পক্ষে রায় দিলে তিনি সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ লাভ করেন।

একই সঙ্গে উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছেন যে, এখন থেকে চাকরিতে নিয়োগের সময় রূপান্তরকামীদের জন্য 'থার্ড ক্যাটাগরি'র উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পৃথিকা পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন করেন। উচ্চ আদালত আরো জানিয়েছেন, সংবিধান অনুযায়ীই একই ধরনের সুবিধা পাওয়ার অধিকার যশিনির মতো সকল তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের রয়েছে। ভারতে পৃথিকাই প্রথম রূপান্তরকামী তৃতীয় লিঙ্গের সরকারি কর্মকর্তা। তবে *টাইমস অব ইন্ডিয়ার* তথ্য অনুযায়ী তামিলনাড়ু পুলিশে ইতিমধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের তিনজন কনস্টেবল রয়েছেন। ভারতে শবনম মৌসি নামে একজন হিজড়া লোকসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশেও হিজড়াদের ট্রাফিক পুলিশে নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে জনমত বাড়ছে। সরকার এ বিষয়ে আন্তরিক ও উদ্যোগী হলে বাংলাদেশ এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন হিজড়াদের ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে নিয়োগের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ব্লগে এ নিয়ে বেশ ভালো আলাপ-আলোচনা জারি রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিশেষ করে হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন এই মতবাদের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে।

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাপ্রবাহ দেশে এক ধরনের অস্থিরতা ও অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে। একের পর এক ব্লগার, লেখক, প্রকাশক, বিদেশি নাগরিক এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হত্যা এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে কিন্তু অপরাধীরা ধরা পড়ছে না। এমতাবস্থায় ব্লগার ওয়াশিকুর রহমানের হত্যাকারীদের হাতেনাতে পাকড়াও করার ঘটনাটি জনমনে উদয় হচ্ছে। এ বছরের মার্চ মাসে রাজধানীর বেগুনবাড়ী এলাকায় দুর্বৃত্তরা ওয়াশিকুর রহমানকে হত্যা করে পালিয়ে যাওয়ার সময় জনতা ও পুলিশ হত্যাকারীদের ধাওয়া করলে লাবণ্য ও তাঁর সঙ্গী নদী (দুজনই হিজড়া) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হত্যাকারীদের ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, লাবণ্য ও নদী যদি সাহস করে দুর্বৃত্তদের ধরতে পারেন, তাহলে পুলিশ কেন পারছে না। এই ঘটনা আমাদের চোখের পর্দা সরিয়ে নতুন সত্য উন্মোচন করেছে। হিজড়াদের পিছুটান নেই। যেহেতু তাঁদের পরিবার, সন্তান, সম্পত্তি কোনো কিছুই নেই, নেই সামাজিক মর্যাদা, সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপনের সুযোগ ও অধিকার, সুতরাং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্ত্রাসী বা দুর্বৃত্তদের পাকড়াও করার মতো মানসিক শক্তি এবং সাহস হিজড়াদের মধ্যে বিরল নয়। 'তৃতীয় লিঙ্গ' বা হিজড়া জনগোষ্ঠী সুযোগ ও অধিকার পেলে, কাজের স্বীকৃতি পেলে দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় দারুণ ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে মনে হয়। এমনকি পুলিশ বা ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে নিয়োগ পেলে নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় অবদান রাখতে সক্ষম হবেন তাঁরা। তবে তার জন্য প্রয়োজন আমাদের সবার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

হিজড়াদের আলাদা একটি লিঙ্গ হিসেবে সরকার স্বীকৃতি দেয়ায় প্রগতিশীলতা ও মানবিকতার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেছে। আশপাশে নানান উদাহরণ আমাদের সামনে চলে আসছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের নাগরিক হিসেবে হিজড়াদের অধিকার

প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসছে। আশা করি, আমরা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারলে, রাষ্ট্র উদ্যোগ নিলে আমাদের দেশেও তাঁদের আর বঞ্চনা, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে না, পরিবার-পরিজন ছাড়া থাকতে হবে না, শিক্ষা, জ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে তাঁরাও সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

মুবিনুর রহমান
এমফিল গবেষক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নারী প্রার্থীদের জন্য প্রতীক বাছাইয়ে নির্বাচন কমিশনের অসচেতন উন্নাসিকতা

বছরের শুরুর দিকে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশন নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে পিঞ্জর, শীল-পাটা, কেটলি, পানপাতা, প্রেসার কুকার ইত্যাদি বরাদ্দ করা হয়েছিল। সমাজের বৃহত্তর পরিসরের বিপরীতে সংকীর্ণ গৃহ পরিসরে নারীকে আবদ্ধ রাখার এই প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষ হিসেবে নারীর মানবিক মর্যাদা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা ও সক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করা হয়। সে সময় নারী প্রার্থীসহ বিভিন্ন মহলের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে প্রতীক বরাদ্দে সতর্ক থাকবে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

বছরের শেষে একই অনুশীলনের পুনরাবৃত্তি ঘটল আসন্ন পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে। নারী প্রার্থীদের জন্য এবার বরাদ্দ করা হয়েছে গ্যাসের চুলা, চুড়ি, পুতুল, ফ্রক, কাঁচি, মৌমাছি, হারমোনিয়াম ইত্যাদি। এবারও বিভিন্নমহল থেকে পরিবার ও সমাজের প্রতি নারীর ভূমিকার অবমূল্যায়নমূলক এই সব প্রতীক বাতিল করে নতুনভাবে প্রতীক বরাদ্দের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সময় স্বল্পতার অজুহাত দেখিয়ে এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেনি বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তার সাথে আগের বারের মতোই, নারীদের অবমাননা করার জন্য নয়, বরং প্রার্থীদের ভোটারের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল এবং পরবর্তী সময়ে প্রতীক বরাদ্দে সতর্ক থাকবে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছি, নারী প্রার্থীদের অবমাননা করার জন্য নয়, বরং প্রার্থীদের ভোটারের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতেই এই প্রতীকগুলো বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু, কোন মনোভাবের কারণে এই প্রতীকগুলো পুরুষ প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়নি এর সদুত্তর কি নির্বাচন কমিশনের কাছে আছে? আর সে কারণেই নারী প্রার্থীসহ নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার প্রতি সংবেদনশীল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বরাদ্দকৃত প্রতীকগুলো পরিবারের স্বল্প পরিসরের চৌহদ্দির মধ্যেই নারীর ভূমিকাকে সীমিত করাকে উৎসাহিত করে, যা রাজনৈতিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ এবং নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের অন্তরায়।

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ যেখানে পরিবারের বাইরে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় পরিসরে নারীর ভূমিকার পরিচায়ক, সেখানে এই প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত একটি পর্যায়ে নারীর সনাতনী ভূমিকার সমার্থক প্রতীক বরাদ্দের মাধ্যমে নারী রাজনীতিকদের ভোটারদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করে। আমরা সাধারণ নারী-পুরুষেরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আপাত দৃষ্টিতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই আমাদের আচরণ, শব্দ চয়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সমতার মূল্যবোধের বিরোধী অনেক কিছুই করি, যার মাধ্যমে নারীর ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডভিত্তিক বৈষম্যমূলক প্রথা, আচার, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিই শক্তিশালী হয়। নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে এই সব নেতিবাচক চর্চা বাধা হিসেবে কাজ করে।

সংবিধানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক আইন-নীতির মাধ্যমে নারীর প্রতি বিদ্যমান সব বৈষম্য বিলোপের মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্র নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও ভূমিকার প্রসারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সেই লক্ষ্যে বৈষম্যমূলক আইন, প্রথা, মূল্যবোধের পরিবর্তন, সংস্কারেও রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের সেই অঙ্গীকার পালনের প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় এবং সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের বিপরীতে এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজের অনুশীলনের মাধ্যমে নারীর প্রতি প্রথাগত সংকীর্ণ সংস্কৃতিকেই উৎসাহিত করছে। পাশাপাশি দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা-কর্মীসহ অসংখ্য নারী, যারা পুরুষের পাশাপাশি সমান দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে রাজনীতি, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখছে তাদের ভূমিকাও অগ্রাহ্য করেছে নির্বাচন কমিশন।

সময় স্বল্পতার অজুহাতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে কী ব্যত্যয় ঘটানো যায়? আসছে বছর নির্বাচন কমিশন যে আরও ব্যস্ত থাকবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে? ■

কামরুন্নেসা নাজলী
মানবাধিকার কর্মী

সাউথ এশিয়ান ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালাইসিস কনফারেন্স ২০১৬

সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালাইসিস দক্ষিণ এশিয়ায় নেটওয়ার্কিং এবং কাউন্সেলিংয়ে ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালাইসিস তত্ত্বের মাধ্যমে কাউন্সেলিং ও সাইকেথেরাপি'র পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষা এবং সাংগঠনিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপির চাহিদাকে চিহ্নিত করে ১৯৯৭ সাল থেকে আসক এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করে। সারা বিশ্বে ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালাইসিস (টিএ) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরিতে, উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করে। পেশাগত ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপিতে এর ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকরী। এ ছাড়াও শিক্ষা ও সাংগঠনিক উন্নয়নে এর ব্যবহার সমাদৃত। টিএ'র কার্যকরী ও কাঠামোগত মান বিবেচনা করে ২০০৩ সালে প্রথমবারের মতো আসক-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে টিএ'র পরিচিতি ঘটে। বিগত ১২ বছরে আসক এবং ভারতের আশা কাউন্সেলিং এবং ট্রেনিং সার্ভিসেসের যৌথ আয়োজনে ৫০০-এর অধিক পেশাজীবী 'TA 101' কোর্স সম্পন্ন করেন, যা মূলত ব্যক্তিগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। এ পর্যন্ত ৫৩ জন পেশাজীবী 'ডিপ্লোমা ইন টিএ– ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালাইসিস তত্ত্বের পেশাগত কোর্সটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত মোট ৩২ জন পেশাজীবী Certified Transactional Analyst (CTA) কোর্সটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে CTA পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য তৈরি হচ্ছেন।

SAATA দক্ষিণ এশিয়াতে টিএ উন্নয়নে প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে আসক-এর সমন্বিত পদক্ষেপের ফলে প্রশিক্ষিত কাউন্সেলর এবং সাইকোথেরাপিস্ট তৈরি হচ্ছে, যারা বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। SAATA এবং আসক যৌথভাবেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো SAATA এবং আসকের যৌথ উদ্যোগে টিএ বিষয়ে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন, অভিজ্ঞতার বিনিময় ও প্রসারের লক্ষ্যে সাউথ এশিয়ান ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালাইসিস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের ২-৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট (কেআইবি) খামারবাড়ি, ঢাকায় এ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়ন এবং পরিবর্তনে আগ্রহীগণ এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। যেমন– থেরাপিস্ট, কাউন্সেলর, শিক্ষক, ট্রেইনার, ডাক্তার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ইত্যাদি। টিএ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন বোর্ড (IBOC) কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা যে-কোনো কনফারেন্সে অনুষ্ঠিত হয়। এবারও কনফারেন্সে আন্তর্জাতিকভাবে টিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টিএসটিএ এবং সিটিএ শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। এদের মধ্যে যারা উত্তীর্ণ হবেন তাদের সনদ প্রদান করা হবে।

কনফারেন্সের মূল প্রতিপাদ্য হল Freedom Within, অর্থাৎ– স্বতঃস্ফূর্ততা ও সচেতনতার সাথে নিজের অনুভূতি চিন্তাকে খেয়াল করে আচরণে এর প্রয়োগের মাধ্যমে মানসিক শক্তির ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জন। ফলে একজন ব্যক্তি তার প্রকৃত ক্ষমতা মূল্যায়ন করে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যের ব্যাপারে আন্তরিক ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও মানসম্পন্ন দেশি-বিদেশি টিএ পেশাজীবী এ কনফারেন্সে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। এ ছাড়াও প্রতিপাদ্যের সংগতি সম্পন্ন বিভিন্ন দেশি-বিদেশি পেশাজীবীগণ ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কেস উপস্থাপন, গবেষণালব্ধ ফলাফল ও পোস্টার উপস্থাপন করবেন। এ লক্ষ্যে আগ্রহীদের কাছ থেকে একটি অনুসরণীয় ফরম্যাটের মাধ্যমে প্রোপোজাল আহ্বান করা হয়েছে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত আগ্রহী ব্যক্তিগণ তাঁদের প্রোপোজাল জমা দিতে পারবেন। কনফারেন্সের মূল বক্তাবৃন্দ হচ্ছেন–

মি. জন হিথ ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালাইসিস অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএএ)-এর প্রাক্তন সভাপতি (২০১১-২০১৫) এবং আইটিএএ-এর ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার; তিনি সাইকোথেরাপি বিভাগের টিচিং অ্যান্ড সুপারভাইজিং ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালিস্ট (টিএসটিএ)। ২০ বছর ধরে ইংল্যান্ডে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করছেন। ২০০৪ সাল থেকে আইটিএএ-এর কনফারেন্স চেয়ার হিসাবে কাজ করেছেন।

মিস পি কে সারু ২৫ বছর ধরে সাইকোথেরাপিস্ট, ট্রেইনার ও কনসালট্যান্ট হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। তিনি সাইকোথেরাপি ও কাউন্সেলিং বিভাগের টিচিং অ্যান্ড সুপারভাইজিং ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালিস্ট (টিএসটিএ)। তিনি নিউরো লিংগুইসটিক প্রোগ্রামিংয়ের একজন মাস্টার প্র্যাকটিশনার। ভারতের আশা কাউন্সেলিং অ্যান্ড ট্রেনিং সার্ভিসেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি SAATA-র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং প্রথম সভাপতি। ২০১৪ সালে ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালাইসিস বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য আইটিএএ কর্তৃক তিনি মুরিয়েল জেমস্ পুরস্কার লাভ করেন।

খুরশিদ এরফান আহমেদ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বাংলাদেশে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ২০১৩ সালে আইটিএএ কর্তৃক তিনি হেজেস কেপারস হিউমানিটারিয়ান পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশে কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি বিষয়কে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের একজন পথিকৃৎ। তাঁর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ বিভিন্ন হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরিসহ কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি সেবা চালু হওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে।

মিস এলানা লেইহ্ সাইকোথেরাপি বিভাগের টিচিং অ্যান্ড সুপারভাইজিং ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালিস্ট (টিএসটিএএ)। দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে সাইকোথেরাপি বিষয়ে কাজ করছেন। টিএ বিষয়ক দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পেশাজীবী সংস্থায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। ■

কনফারেন্সের বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্য আসক ওয়েবসাইটে (www.askbd.org) ক্লিক করুন। এ ছাড়া ask@citechco.net ও psh@askbd.org তে ইমেইল করতে পারেন।